ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুবাদ
সুধীরকুমার চৌধুরী

সাহিত্য অকাদেমি
নয়া-দিল্লী
1959

সূচী

কলকাতায় একটি সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়, এবং বিচার সংক্রান্ত কাজের ভার পড়ে একজন চিফ জাস্টিস বা প্রধান বিচারপতি এবং তিনজন পিউনি জজ বা অবর বিচারপতির উপর।

দেশের শাসন-ব্যবস্থার এইসব পরিবর্তনের ফলে নবাগত শাসক-সম্প্রদায়কে দেশের লোকের ঘনিষ্ঠ সংসর্গে আসতে হয়। দুটি সংস্কৃতির মধ্যে এর থেকে সঙ্ঘাতের সৃষ্টি হওয়া ছিল অপরিহার্য্য। একদিকে বার্দ্ধক্য-জর্জর প্রাচীন দেশীয় সংস্কৃতি, যা প্রাণশক্তি হারিয়ে কতকগুলি কুসংস্কারাপন্ন ধারণা এবং আচার-নিয়মের বাঁধাবাঁধির জালে জড়িয়ে পড়েছে ; আর একদিকে নূতন একটি বহিরাগত সংস্কৃতি যা এসেছে প্রাণপ্রাচুর্য্য নিয়ে, আর সেই সঙ্গে এসেছে জড়বিজ্ঞান-সন্ধিৎসুর নবলব্ধ জ্ঞানের সমৃদ্ধি। বলা চলতে পারে, ভারতীয় সংস্কৃতি বার্দ্ধক্যের ভারেই তখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। যৌবনোচিত তেজঃ-বীর্য্য ফিরিয়ে আনতে বৈদ্যুতিক 'শক' দেওয়ার মত প্রচণ্ড ধাক্কা খাইয়ে তার চিকিৎসা করা দরকার ছিল। দুটি সংস্কৃতি পরস্পরের কাছাকাছি আসাতে যে সংঘাত বাধল তার ফল হল এই ধাক্কা খাওয়ানোর চিকিৎসারই মতন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Renaissance of India নামক বইয়ে উনিশ শতকের অব্যবহিত পূর্বেকার ভারতবর্ষের যে একটি যথাযথ বর্ণনা দিয়েছেন সেটি এইরূপ :

"সব মিলিয়ে আমরা যা দেখি তা হ'ল একটি বিরাট্ শক্তির রূপ, যে শক্তি একটা নূতন জগতে, নূতন এবং অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে জেগে উঠে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধনজড়িত দেখতে পাচ্ছে ; অসংখ্য স্থূল এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সে-সব বন্ধন, যে-সব বন্ধন-রজ্জুর কিছু তার নিজের অতীত দিয়ে বোনা, কিছু বা সাম্প্রতিককালে বাইরে থেকে এসে তাকে জড়িয়েছে ; আর তার প্রয়াস চলেছে এই সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হবার, মাথা তুলে উঠে নিজেকে জানান দেবার এবং নিজের আত্মাবস্তুটিকে দিকে দিকে প্রসারিত করে দিয়ে বিশ্ব ব্যাপারে নিজের নাম মুদ্রাঙ্কিত করবার।"

এই সংঘর্ষের ইতিহাসই উনিশ শতকের বাংলাদেশের ইতিহাস। অভিনব ভাবধারার আলোড়ন নূতন নূতন কর্মপ্রেরণার উৎসমুখ খুলে দিল, যার ফলে জীবনের নানা ক্ষেত্রে নূতন নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত হল, যাদের একাভিমুখী ও পরস্পর-বিরোধী স্রোত এই সময়কার ইতিহাসকে

একাধারে চিত্তাকর্ষক ও জটিল করেছে। সংক্ষেপে বলা যায়, নূতন সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসাতে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির দেহে যেন নূতন প্রাণের সঞ্চার হল আর সেই প্রাণোচ্ছলতার পরিণাম হল সুদূর-প্রসারী। বস্তুতঃ আমাদের জীবনের কোনো একটি দিক্‌ও এই সঙ্ঘাত থেকে মুক্ত রইল না। আমাদের ধর্ম, আমাদের সামাজিক রীতিনীতি, আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি, আমাদের সাহিত্য, সবই প্রভাবিত হল এর দ্বারা। এমন কি পরিবর্তন এল আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারাতেও, এবং শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়তাবোধের যে বীজ বোনা হল তাই পরের শতকে সঞ্চারিত হল প্রচণ্ড স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নিয়ে, যা পরিশেষে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এনে দিল।

কিন্তু সংস্পর্শ না থাকলে সঙ্ঘর্ষ আসত না এবং সংস্পর্শ হত না যদি ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ এদেশের লোকের না থাকত। নূতন শাসকেরা অবশ্য ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ সুবিধা না দেওয়ার নীতিই প্রথমে গ্রহণ করেছিলেন, সেইটেই বুদ্ধির কাজ হবে মনে করে। নূতন আমেরিকা মহাদেশে তাঁদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এ হল তারই প্রতিক্রিয়া। সেখানে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি তাদের আদিমাতৃভূমির ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। নূতন শাসকদের ভয় হল যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ভারতবর্ষীয়দের জাতীয়তা বোধের উন্মেষে সহায়তা করবে, যা হবে তাঁদের নিজেদের স্বার্থের প্রতিকূল। সুতরাং তাঁরা যে বিচার বিবেচনা করেই দেশীয় শিক্ষা-পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষকতা করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

এর ফলে আমরা দেখতে পাই, ১৭৮১ সালে ফারসী ও আরবী সাহিত্যে শিক্ষাদানকে উৎসাহিত করবার জন্যে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতা মাদ্রাসার দ্বারোদ্ঘাটন করছেন। একই নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁরা ১৭৯১ সালে সংস্কৃত বিদ্যার প্রসারকে উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে বেনারস সংস্কৃত কলেজের ভিত্তিস্থাপন করেন। ইংরেজী শিক্ষাদানের ব্যাপারটা, সরকারের সঙ্গে কোনো যোগ নেই এমন ব্যক্তিদের এবং মিশনারিদের উদ্যমের উপর ছেড়ে রাখা হল। অ্যারাটুন পিড্রুস ইংরেজী শেখাবার জন্যে কলকাতায় একটি স্কুল পরিচালনা করতেন। রেভারেণ্ড মে চুঁচুড়াতে একটি

স্কুল খুলেছিলেন। শেরবোর্নেরও একটি স্কুল ছিল কলকাতায়। উনিশ শতকের বিশিষ্টতম ব্যক্তিদের একজন হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, তিনিও এঁরই তত্ত্বাবধানে ইংরেজী শিখেছিলেন।

ইংরেজী শিক্ষার চাহিদা বেড়ে যাবার পর দেখা গেল, এই ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলি সে চাহিদা মেটাতে অসমর্থ। এই দাবী মেটানর মত বদান্যতা সরকার দেখালেন না বলে জনসাধারণের মধ্য থেকেই তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই কাজে এগিয়ে এলেন। রামমোহন রায় ১৮১৪ সাল থেকে কলকাতায় বসবাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি খুব আন্তরিকতার সঙ্গে এই কাজে যোগ দিলেন। ডেভিড হেয়ার নামক স্কটল্যাণ্ডের একজন বণিক্ তাঁর সক্রিয় সহায়ক হলেন। ইনি ছিলেন সেই অত্যল্প-সংখ্যক দুর্লভ মানুষদের একজন, যাঁরা জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষকে ভালবাসেন, এবং নিজেদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের মানুষদেরও হিতসাধন করতে পেলে খুশী হন। ইনি ঘড়ির ব্যবসা করবেন বলে ভারতবর্ষে এসে দেশটার প্রতি এতই অনুরক্ত হয়ে পড়লেন, যে এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন স্থির করলেন। ইংরেজী শিক্ষা প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করে ইনি সেই উদ্দেশ্যে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন যেটি পরবর্তীকালে তাঁরই নামে পরিচিত হয়েছিল।

রামমোহন ও ডেভিড হেয়ার ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের জন্যে সরকারকে অনেক সাধ্যসাধনা করলেন, কিন্তু সে সমস্তই ব্যর্থ হল। কাজেই তাঁদের বাধ্য হয়ে নিজেরাই উদ্যোগী হতে হল, যার ফলস্বরূপ জনসাধারণের দান-লব্ধ অর্থে ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী তারিখে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। এই কলেজ প্রতিষ্ঠা কালীন স্মারকলিপিতে বলা হয়েছিল এর লক্ষ্য হবে একে এমন একটি প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলা যা হবে, "সর্বাগ্রগণ্য প্রশস্ত একটি কাটা খালের মত যার ভিতর দিয়ে ইউরোপীয় উৎস হতে সত্যকার জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারা হিন্দুস্থানের বুদ্ধিমত্তার মধ্যে প্রবাহিত হবে।"

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার দ্বার এইভাবে উন্মুক্ত হয়ে যাবার পর দুটি সংস্কৃতি পরস্পরের খুব কাছে চলে এল। এই সংস্পর্শের ফল ফলতেও দেরি হল না। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রথমে এর প্রভাব অনুভূত হল সবচেয়ে বেশী। এটা হবার কারণ ছিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পূর্ব ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

করবার পর তাঁদের পিছনে খ্রীষ্টীয় মিশনারিরা এলেন। বাঙালী হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী দেবদেবীর মূর্তিকে প্রতীক রূপে ব্যবহার করে জগদীশ্বরের আরাধনা করত। খ্রীষ্টীয় মিশনারিরা এ জিনিষটিকে ভালচোখে দেখলেন না, তাঁরা জড়ের উপাসনা বলে প্রকাশ্যে এর নিন্দাবাদ শুরু করলেন। তাঁরা এমন একটি সংস্কৃতির প্রতিভূ হয়ে এসেছিলেন, যা সাম্প্রতিক কালে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যাকে পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়ে বাষ্পীয় জাহাজ এবং রেলপথ নির্মাণে সমর্থ হয়েছে। তখনকার দিনের শিক্ষিত বাঙালীদের কাছে এর নবার্জ্জিত মোহিনী মায়া প্রবল আকর্ষণের বস্তু ছিল, এবং প্রাচীন ক্ষীয়মাণ একটি সংস্কৃতির ধর্মগ্রন্থগুলির সঙ্গে তুলনায় এর মূল্যও ছিল অনেক বেশী।

হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও নামক হিন্দু কলেজের যুবাবয়সী, প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর ইঙ্গভারতীয় একজন অধ্যাপকের কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে এই বিদ্রোহী মনোভাব খুব তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করল। যুক্তিবিচারের সাহায্য নিয়ে জ্ঞানার্জ্জনের পথে পদক্ষেপ সমর্থন করে তিনি যা বলতেন তা তাঁর তরুণ ছাত্রদের মনোহরণ করল এবং হিন্দুদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান-গুলি সম্বন্ধে তাঁর বিরূপ মতবাদ শুনে তাদের মনে সেই ধর্মের বিরূদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাব জন্মাল। এর ফলে, "মূর্ত্তিপূজার অসারতা এবং পুরোহিতদের কপাটাচার এই বিষয়গুলি নিয়ে কলকাতার শীর্ষস্থানীয় হিন্দু যুবকদের তরুণ, নির্ভীক, আশাবাদী অন্তরগুলির একেবারে অন্তস্তল অবধি আলোড়িত হল।"[১]

এঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮২৮ সালে একাডেমিক এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। মানিকতলার একটি বাগানবাড়ীতে এর যে সপ্তাহিক অধিবেশনগুলি বসত, তাতে সে-সময়কার সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্মীয় সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা হত। এর ক্রিয়াকলাপের একটি বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় এঁদের সমসাময়িক লালবিহারী দের লেখা থেকে :

"একাডেমাসের এই উপবনে . . . কলকাতার বাছাবাছা প্রতিভাবান্, যুবকেরা, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, তখনকার দিনের সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্মসংক্রান্ত বিতর্কের বিষয়গুলি নিয়ে বাগ্মিতা সহকারে নিজেদের বক্তব্য

১। টমাস এডোয়ার্ড-এর "হেনরী ডিরোজিও," পৃঃ ৩২।

বলতেন। বিতর্কের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটির কোনও ব্যতিক্রম ছিল না তা হ'ল প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে একটি সুস্পষ্ট বিদ্রোহ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ একাডেমির এই তরুণ বয়স্ক সিংহেরা এই বলে গর্জন করতেন, হিন্দুধর্ম নিপাত যাক, সব রকমের গোঁড়ামি নিপাত যাক।"

সুতরাং এই বিদ্রোহী মনোভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে বহুসংখ্যক ধীশক্তি-সম্পন্ন ছাত্ররা যে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন, তাতে বিস্মিত হবার কিছু ছিল না। এদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রদের একজন, মহেশচন্দ্র ঘোষ, ১৮৩২ সালের আগস্ট মাসে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়াতে হিন্দু সমাজে খুবই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তাঁর সতীর্থ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। এর পরের দশকের আর একজন উল্লেখযোগ্য ধর্মান্তর-গ্রহিতা হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, যিনি বাংলা সাহিত্যের একজন স্রষ্টা হিসাবে বহুসম্মানিত একটি স্থান অধিকার করে আছেন। দুটি সংস্কৃতির সঙ্ঘাতের ফল, এক দিকে কি হয়েছিল, এর থেকে তা বোঝা যায়।

কিন্তু রামমোহন রায়েরই নেতৃত্বে অন্য এক দিকে এর আর এক রকম প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা গেল। সাকার উপাসনাকে তিনি যদিও সমানই বিরূপতার চোখে দেখতেন, কিন্তু নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরক্তির গ্রন্থিবন্ধনগুলি ছিল দৃঢ়তর। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রগুলি বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য খুবই গভীর ছিল বলে তিনি বহুপ্রাচীন কালেও যে নিরাকার উপাসনার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তার সন্ধান পেলেন। উপনিষদ্‌গুলিতে ব্রহ্মন্‌কে নিরাকার রূপে কল্পনা করা হয়েছে। তিনি এই কল্পনাকে একেশ্বরবাদের রূপ দিয়ে, নিরাকার-উপাসনা-ভিত্তিক ধর্মানুষ্ঠানের জন্যে একটি উপাসকমণ্ডলী গঠন করলেন। প্রথমে তিনি নিজের কয়েকজন সমবিশ্বাসী বন্ধুকে নিয়ে একটি চক্র গঠন করলেন, এবং তার নাম দিলেন 'আত্মীয় সভা'। সেই সময়ে আপার সার্কুলার রোড নামে পরিচিত রাস্তার উপরে তাঁর নিজের বাসভবনে এই সভার অধিবেশন বসত। তাঁর অনুগামীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি বৃহত্তর দল গঠন করবার এবং তাদের নিজস্ব একটি সম্মিলিত উপাসনার স্থানের প্রয়োজন অনুভূত হতে লাগল। এর ফলে ১৮২৮ সালের আগস্ট মাসে সভাটিকে 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে রূপান্তরিত করা হল, এবং জোড়াসাঁকোর একটি ভাড়াবাড়ীতে কেবল তার নিজেরই ব্যবহারের জন্য

স্থান নির্দিষ্ট হল। এর অল্প কিছুদিন পরে সেই অঞ্চলেই ৫৫ চিৎপুর রোডে সমাজের নিজের বাড়ী তৈরি হল, এবং ১৮৩০ সালে সমাজ উঠে গেল সেই বাড়ীতে। এর পর রামমোহন দিল্লীর তদানীন্তন বাদশাহের দ্বারা নিয়োজিত হয়ে তাঁর একটি বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্যে যুক্তরাজ্যে চলে যান। দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে ব্রিস্টল শহরে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলে সেই শহরেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

এরপর যতদিন না রামমোহনের সুযোগ্য শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরপুরুষ রূপে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে এলেন, ততদিন নায়কহীন ব্রাহ্মসমাজের একটু দুরবস্থার মধ্য দিয়ে কাটল। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন রামমোহনের অন্তরঙ্গ বন্ধু দ্বারকানাথের পুত্র এবং রামমোহন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়েই ইনি শিক্ষালাভ করেন। গুরুর ভাবধারাকে ইনি সহজেই আত্মসাৎ করে নিলেন এবং যথাসময়ে ব্রাহ্মসমাজকে একটি স্বতন্ত্র ধর্মসম্প্রদায়ে পরিণত করে এবং কুড়িজন অনুগামী সহ ১৮৪৩এর একুশে ডিসেম্বর এই নবধর্মে আনুষ্ঠানিক ভাবে দীক্ষা গ্রহণ করে প্রকাশ্যে প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ঘোষণা করলেন। তাঁর পূর্বগামী রামমোহনের মত তিনিও তাঁর কৌলিক ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রেখেছিলেন; এমন কি, হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করবার জন্যে খ্রীষ্টান মিশনারিরা যে-সব আক্রমণাত্মক পন্থা অবলম্বন করতেন তার বিরুদ্ধে এই ধর্মের পক্ষ নিয়ে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধেও নেমেছিলেন।

হিন্দুদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের গায়েও এই সঙ্ঘাতের ধাক্কা বেশ জোরের সঙ্গে এসে লেগেছিল। হিন্দু-সমাজে, তার অধোগতির যুগে, অন্যায়, এমনকি অমানুষিক বলা যেতে পারে, এমন কতগুলি প্রথার প্রচলন হয়েছিল। উনিশ শতকের বহু প্রগতি-আন্দোলনের প্রবর্তক রামমোহনের দৃষ্টি এদিকেও আকৃষ্ট হল। বিধবাকে তার মৃত স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় পুড়িয়ে মারার যে প্রথাকে সতীদাহ বলা হত, অত্যন্ত বর্বরোচিত বলে সেইটি বিশেষ করে তাঁর চিন্তার বিষয় হল। সরকারকে দিয়ে আইন করিয়ে এই প্রথা বিলোপ করবার জন্যে তিনি আন্দোলন শুরু করলেন। গোড়ার দিকে তাঁর জুটল প্রত্যাখ্যান। ১৮১৮ সালে লর্ড আমহার্স্টের কাছে তিনি যে আবেদন পত্র পাঠিয়েছিলেন তাতে এই কারণ দেখিয়ে প্রথার বিলুপ্তি

চেয়েছিলেন, যে, এই সতীদাহের ঘটনাগুলি, "সমস্ত ধর্মশাস্ত্র অনুসারে এবং সব দেশের মানুষের সহজ বুদ্ধির বিচারে নরহত্যা।"

এই বিষয়টিতে কি কারণে লর্ড আমহার্স্ট হস্তক্ষেপ করতে চাননি তা তাঁর নিম্নলিখিত মন্তব্য থেকে বোঝা যাবে :

"একটা ঘোরতর পাপাচার সম্বন্ধে আমাকে উদাসীন মনে হতে পারে এই অবাঞ্ছিত সম্ভাবনা আছে জেনেও আমি অকপটে স্বীকার করছি, আজকের দিনে এদেশীয়দের মধ্যে জ্ঞানোন্মেষের যে অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে, এই অতি জঘন্য কুসংস্কারাপন্ন প্রথাটির ক্রমিক অবলুপ্তির জন্যে তারই উপর নির্ভর করে থাকার পরামর্শই আমার বেশী মনঃপূত।"

লর্ড আমহার্স্টের পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক কার্যভার গ্রহণ করার পর রামমোহন আবার তাঁর চেষ্টা শুরু করলেন। এবার তাঁর সঙ্গে রইলেন তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ সহকর্মী দ্বারাকানাথ ঠাকুর। লর্ড আমহার্স্ট যে কারণে এই ব্যাপারে হাত লাগাতে ইতস্ততঃ করেছিলেন, তা হল এই যে, তাঁর ধারণা ছিল, সতীদাহ হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানের একটি অঙ্গ, এবং তাঁর ভয় ছিল, আইন করে একে নিষিদ্ধ করে দিলে জনগণের ধর্মানুরক্ত মনে আঘাত দেওয়া হবে। সংস্কারকরা তাই এই সমস্যার মোকাবিলা করার পন্থা পরিবর্তন করে এই বলে তাঁদের বক্তব্যকে উপস্থাপিত করলেন, যে, "যদিও দীর্ঘকাল ধরে আচরিত প্রথা হিসাবে এই নৃশংস আচার ফলতঃ আইনের মর্যাদা লাভ করেছে, তা সত্ত্বেও হিন্দুদের কোনও ধর্মশাস্ত্রে এই অনুষ্ঠানটির অনুমোদন নেই।"[১]

এই তথ্য লর্ড বেন্টিঙ্কের হাতে একটি অস্ত্রস্বরূপ হল, এবং এরপর আইন প্রণয়ন দ্বারা এই বর্বরোচিত নৃশংস প্রথাকে সমূলে নির্মূল করার কাজে তিনি আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করলেন না। তাঁর এই সাহসিকতা যে যুক্তিসঙ্গত হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল এইভাবে, যে, দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা তখন দুটি সংস্কৃতির সংঘাতের ফলে এমনই হয়ে চলেছিল, যে এই নূতন আইনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে লেশমাত্র বিক্ষোভের লক্ষণ দেখা গেল না।

এর অল্প কিছুদিন পরে, একই গভর্ণর জেনারেলের শাসন কালের মধ্যে

১। দ্বারকানাথ ঠাকুরকে লেখা লেডী বেন্টিঙ্কের একটি চিঠির অংশ।

সরকারের শিক্ষা-সংক্রান্ত নীতির আমূল পরিবর্তন হল। এটা সম্ভব হল গভর্ণর জেনারেলের পরিষদের একজন সদস্য ব্যাবিংটন মেকলের উদ্যোগে। সব কিছুতেই পরিবর্তন আসছে এমন একটা সময়ে কতকগুলি নূতন প্রবণতা লক্ষ্য করে তাঁর মনে হল, নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজের সহায়তায় সেই সময়ে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার যে প্রসার চলছিল তার সঙ্গে এগুলির প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে, এবং তাই তাঁর ধারণা জন্মাল যে, নূতন পরিস্থিতিতে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করলে কোম্পানী তাতে বেশী লাভবানই হবেন। এ বিষয়ে তিনি যা ভাবছিলেন, তাঁর পিতাকে লিখিত একটি চিঠিতে তা খুব আবেগপূর্ণ ভাষায় তিনি সরল মনে লিপিবদ্ধ করেছেন। মনে করে রাখবার মত এই চিঠিটির অংশ বিশেষের যে অনুবাদ নীচে দেওয়া হল তাতে আমরা যা বলছি তার সমর্থন পাওয়া যাবে।

"হিন্দুদের উপর এই শিক্ষার (ইংরেজী শিক্ষার) ফল যা হয়েছে তা বিস্ময়কর। ইংরেজী শিক্ষা পাবার পর কোনো হিন্দুর নিজের ধর্মের প্রতি অন্তরের টান আর থাকছে না। কেউ কেউ নিজেদের স্বার্থের খাতিরে কপটতা করে বলেন, এই ধর্মে তাঁদের বিশ্বাস আছে। অনেকেই যুক্তিভিত্তিক বিচারে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কেউ কেউ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আমরা শিক্ষা সম্বন্ধীয় আমাদের পরিকল্পনাগুলি নিয়ে কাজ করে যাই তাহলে আর ত্রিশ বৎসর পরে বাংলাদেশের ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে একজনও মূর্তিপূজক অবশিষ্ট থাকবে না। আর এটা ঘটবে ধর্মান্তরিত করার কোনো চেষ্টা ছাড়া, কারও ধর্মাচরণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে, শুধুমাত্র শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ও মানসিক চেতনার ক্রিয়ার ফলে। সম্ভাব্য ভবিষ্যতের এই ছবি আমার হৃদয়কে আনন্দাপ্লুত করছে।"[১]

এটা বেশ বোঝা যায় যে, যে-কারণটা তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল সেটা হল এই যে, সত্যসত্যই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা লাভ করবার পর শিক্ষিত বাঙালীদের মনে নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে একটা বিরূপতার ভাব দেখা দিচ্ছিল এবং কারও কারও ক্ষেত্রে সেটা এতটাই বেশী হচ্ছিল, যে, তাঁরা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করতেও এগিয়ে আসছিলেন। এইভাবে ক্রমশঃ ভারতীয়দের মন ইউরোপীয় সংস্কৃতি দ্বারা যে বিজিত হবে সেটা অবশ্যম্ভাবী এবং তার থেকে আর

১। Trevelyan : Life and Letters of Lord Macaulay, vol. I, p. 464.

একটি নূতন তৈরি বন্ধনে নব সংস্থাপিত এই সাম্রাজ্য ব্রিটনদের দেশের সঙ্গে আবদ্ধ হবে। ভবিষ্যতের এই চিত্রটিই তাঁর মনকে এমন আনন্দে ভরপূর করে তুলেছিল। কিন্তু এর পরেকার ইতিহাস তাঁর এই সমস্ত ভবিষ্যৎ কল্পনাকে ভুল প্রতিপন্ন করে দিল। দেখা গেল, সাংস্কৃতিক সংঘাত দেশজ সংস্কৃতিকে মূল সুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিল না, দুটি সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে এমন একটি নব-যৌবন-ফিরে-পাওয়া নূতন ভারতীয় সংস্কৃতির জন্ম হল যা নিজের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে অপর সংস্কৃতির উপাদানগুলিকে আত্মসাৎ করে নিল।

মেকলের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার যে নূতন নীতি গ্রহণ করলেন, ১৮৩৫ সালের ২য়া ফেব্রুয়ারী তারিখে গৃহীত সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের একটি সিদ্ধান্তে তা এইভাবে বর্ণিত হয়েছে : "ভারতবর্ষের দেশজ লোকদের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চর্চাকে অগ্রসর করে দেওয়া ব্রিটিশ সরকারের ঐকান্তিক লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং শিক্ষাখাতে খরচের জন্যে যে টাকা বরাদ্দ করা থাকবে তা শুদ্ধমাত্র ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে সমীচীন।"

এই প্রকার পরিবেশে, মেদিনীপুর জেলার দূরপ্রান্তে এক পল্লীগ্রামে সংস্কৃত-চর্চার ঐতিহ্যবাহী এক নিষ্ঠাবান্ দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়। একটি যুগ থেকে আর একটি যুগে উত্তীর্ণ হবার এই সময়টাতে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুতগতিতে নানা রকমের পরিবর্তন ঘটে চলেছিল। এদেশের যুবকদের সম্মুখে ইংরেজী শিক্ষার দ্বার একবার খুলে যাবার পর দুটি সংস্কৃতি পরস্পরের খুব কাছে এসে পড়ায় তাদের অনিবার্য সংঘাতে যে প্রতিক্রিয়া-ধারার উদ্ভব হল সেটা জনজীবনের নানাদিকে লক্ষণীয় সব পরিবর্তন এনে দিতে লাগল। যে নূতন ভারতবর্ষ জন্ম নেবে তাকে রূপ দেবার জন্যে উদ্দীপনায় ভরপুর এই সময়টিতে শক্তিশালী নানা প্রভাব এবং প্রেরণা কাজ করতে লাগল। নিষ্প্রাণ অবসাদের অবস্থা আর রইল না। সঙ্ঘাতের প্রচণ্ড ধাক্কায় বহু যুগের নিদ্রাভঙ্গের পর ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা জাগ্রত হল। নূতন নূতন চিন্তা, নূতন নূতন ভাবধারা সমষ্টি-মনে উদ্বেলিত হয়ে উঠে আত্ম-প্রকাশের পথ খুঁজতে লাগল। ভারসাম্যের সম্পূর্ণ অভাবের যুগ ছিল এটা, যখন সব কিছুতেই ছিল অব্যবস্থিততা। ভবিষ্যতের চেহারাটা যে কিরকম হবে তা বলা ছিল খুবই কঠিন। যারা সাহস করে এবিষয়ে কিছু

বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁরাই দেখতে পাচ্ছিলেন যে তাঁদের সমস্ত ভবিষ্যৎ-কল্পনা মিথ্যা প্রতিপন্ন হচ্ছে, যেমন স্পষ্টই দেখা গিয়েছিল মেকলের বেলায়। গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলে আত্মপ্রকাশের নূতন্ নূতন পথ উন্মুক্ত করে নিতে কঠোর প্রয়াস করে চলেছে, জীবনীশক্তির এমনই একটি পুনরভ্যুদয় তখন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।

সময়টাকে কোনো কোনো ঐতিহাসিক যে বাংলা দেশের 'রেনেসাঁস' বলে অভিহিত করেছেন তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। এই দাবীর পিছনে বাস্তবিকই যুক্তি কিছুটা আছে, কারণ, যা ঘটছিল তা কিছু পরিমাণে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির 'নবজন্মের' সঙ্গে তুলনীয় যা নিউ লার্নিং[১] বা 'নূতন বিদ্যার' পুনরুজ্জীবনের পর ইউরোপে দেখা গিয়েছিল। যে সঙ্ঘর্ষের সৃষ্টি হল তা অল্পবিস্তর অনুভূত হল জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই। দুটি আন্দোলনের পিছনেই যে সব শক্তি কাজ করছিল তা প্রচণ্ড। কিন্তু সাদৃশ্যের লক্ষণগুলির এইখানেই শেষ। শেষ অবধি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, দুটির মধ্যে রয়েছে মূলগত পার্থক্য। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় 'রেনেসাঁস' বা নবজন্ম বাস্তবিকই ছিল একটি পুরাতন সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন, যে সংস্কৃতি 'অন্ধকার যুগে' দার্শনিক পণ্ডিতীর সব কিছু চাপা দেওয়ার চাপে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল। যা ঘুমিয়ে পড়েছিল তা জেগে উঠল। মাঝখানকার তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা অতীতের সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিন্ন করে দিতে পারেনি।

কিন্তু বাংলাদেশে যা ঘটেছিল তা ছিল একটু ভিন্ন রকমের। জাতির প্রাচীন সংস্কৃতি বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে যেন জর্জর হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাকে নিয়ে আসা হল নূতন করে মাথা তুলে উঠে দাঁড়ানো পশ্চিম মহাদেশের ভিন্ন জাতের একটি সংস্কৃতির খুব নিকট সংস্পর্শে। এতে যে ঠোকাঠুকি বাধল তার ফলে কতগুলি সমন্বয়ের পথ ধরে নূতন সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান নিজের অঙ্গীভূত করে নিয়ে পুরাতন সংস্কৃতি কতকটা পরিবর্তিত হয়ে গেল। এটা পুনর্জাগরণ ততটা নয়, যতটা একীকরণ।

এই রকম একটা অপরিণত অব্যবস্থিততার যুগে, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম হল। সঙ্ঘাত তখন বেধে গিয়েছে এবং মূর্তিবদলের

১। ষোড়শ শতাব্দীতে গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিখবার জন্য ইউরোপে নবজাগ্রত আগ্রহ।

ব্যাপার তার নিজের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। তাঁর জন্মের আগেই হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়েছে। যখন তিনি আট বৎসরের বালক, ব্যাপারটার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝবার পক্ষে অত্যন্তই অপরিণত বয়স, তখন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যখন তেরো থেকে উনিশের মধ্যে তাঁর বয়স, পড়াশোনার মধ্যে গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে আছেন, ধর্মীয় আন্দোলনগুলি তখন খুব আন্তরিকতার সঙ্গে শুরু হয়ে গিয়েছে। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে তাঁর প্রচার অভিযান আরম্ভ করেছেন। বয়সে বিদ্যাসাগরের চেয়ে মাত্র তিন বৎসরের বড় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং বিদ্যাসাগরের স্কুল কলেজ পাঠের পর্ব যখন সমাধা হল তখন এটি তাঁর হাতে একটি স্বতন্ত্র ধর্মের রূপ নিয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবন অতিক্রান্ত হবার পূর্বে সরকারের শিক্ষা-নীতি আমূল পরিবর্তিত হয়। প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান সম্প্রসারণের মধ্যেই পৃষ্ঠপোষকতার সমস্তটা আবদ্ধ রাখার নীতি পরিত্যক্ত হয়ে ইংরেজী শিক্ষার ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন জেলায় জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ইংরেজী শিক্ষা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

চতুষ্পার্শ্বের অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়ে চলেছে, এই প্রকার একটি চাঞ্চল্যকর সময়ের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের বয়োবৃদ্ধি হতে লাগল। যে মহত্ত্বের বীজ স্বভাবে নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন তা একটি অন্তর্নিহিত অনুপ্রাণনার রূপ নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠে তাঁর জীবনের ধারাকে এমনভাবে বইয়ে নিয়ে গেল যাতে তিনি তাঁর দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তাঁর বিধিনির্দিষ্ট ভূমিকাটি গ্রহণ করতে পারেন। দুটি সংস্কৃতির সঙ্ঘাতের ফলে যে নূতন সংস্কৃতি জন্মলাভ করছিল, তাকে রূপায়িত করার কাজে তাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

১। 'অন্ধকার যুগ'—Dark Age: মধ্যযুগের প্রথম দিক্‌কার কয়েক শতাব্দী, যখন মানুষের বুদ্ধি অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল।

জীবনী

হুগলী জেলার বনমালীপুর নামক গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষদের আদি বাসস্থান ছিল। অধ্যাপনা ছিল তাঁদের পেশা, সংস্কৃতে শিক্ষাদানের জন্য টোল পরিচালনা করে তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর প্রপিতামহ ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে নিয়ে এই ইতিবৃত্ত আরম্ভ করা যেতে পারে। ইনি পাঁচ পুত্র রেখে মারা যান। তৃতীয় পুত্র রামজয় ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ।

পিতা ভুবনেশ্বরের মৃত্যুর পর পাঁচ ভ্রাতা কিছুদিন একসঙ্গে বাস করেছিলেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই রামজয় এটা লক্ষ্য করে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন যে, তাঁর অন্য ভ্রাতারা পরস্পরের সঙ্গে শান্তি বজায় রেখে একত্র বসবাস করতে পারছেন না। এতে তাঁর মনে এত বেশী বিতৃষ্ণা জাগল যে পরিবারবর্গের দেখাশোনার কোনো ব্যবস্থা না করেই গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন।

তাঁর পরিবার বলতে তখন ছিল তাঁর চার কন্যা, দুই পুত্র এবং তাঁর পত্নী দুর্গা দেবী। স্বামীর গৃহত্যাগের পর কিছুদিন যেতেই দুর্গা দেবী বুঝতে পারলেন যে, তাঁর স্বামীর ভাইয়েরা তাঁদের ভরণ-পোষণের ভার নিতে অনিচ্ছুক। এ অবস্থায় কি করা উচিত বুঝতে না পেরে তিনি বীরসিংহ গ্রামে তাঁর পিতার আশ্রয়ে চলে গেলেন। এই গ্রামটি পূর্বে হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল, পরে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। দুর্গা দেবীর পিতা উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের মনটি ছিল নরম, তিনি বিনা দ্বিধায় নিজের কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করলেন। কন্যা যাতে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর জন্যে একটি আলাদা কুটীর নির্মাণ করে দিলেন। কিন্তু উমাপতি তখন বৃদ্ধ হয়েছেন, এবং দেখা গেল, তাঁর যে ছেলেদের উপর তাঁর নির্ভর, তারা খুব দরাজ হাতে তাদের ভগ্নীকে সাহায্য করতে উৎসাহী নয়। তাদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে যে অনিচ্ছুক বদান্যতা ক্ষীণধারায় নির্গত হত, একটি বৃহৎ পরিবারের অভাব মিটাবার পক্ষে তা

যথেষ্ট ছিল না। তাই, স্বভাবে সাহসিকতা ছিল বলে দুর্গা দেবী সুতা কেটে আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে নিলেন।

মাতা যেরকম দুঃসাহসিকতা নিয়ে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলে-ছিলেন তাতে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কিশোরবয়স্ক ঠাকুরদাস কেবল যে বিস্ময়বিমুগ্ধ হলেন তাই নয়, তাঁর মধ্যে একটা দায়িত্ববোধ জাগ্রত হল। পনেরো বৎসর বয়স হবার আগেই তিনি লেখাপড়া কিছুটা শিখেছিলেন, তাই ভাবলেন, এবারে একটা কাজের জোগাড় করে মায়ের উপরকার বোঝার ভার খানিকটা নিজে বহন করবার তাঁর সময় হয়েছে। আর এই ভেবেই তিনি মাতৃগৃহের আশ্রয় ত্যাগ করে সেই বয়সেই কলকাতায় চলে এলেন কর্মের সন্ধানে। অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করবার পর মাসিক দুটাকা বেতনের একটি চাকরি জুটে গেল তাঁর। কিন্তু এই কাজে এমনই যোগ্যতার পরিচয় তিনি দিলেন যে, খুব অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর বেতন বেড়ে মাসে পাঁচ টাকা হল। তখনকার দিনে এক টাকাতে অনেক কিছু করা যেত। তাই এরপর পরিবারটির দুর্গতির দিনগুলির অবসান হল।

অনতিকাল পরেই ঠাকুরদাসের ঘর-পালানো পিতা রামজয় তর্কভূষণ স্বগ্রামে ফিরে এসে দেখতে পেলেন তাঁর স্ত্রী সে-গ্রাম ত্যাগ করে গিয়েছেন। স্ত্রীর সন্ধানে তিনি বীরসিংহ গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে তাঁর এই গৃহে প্রত্যাবর্তন নিয়ে মহোৎসব শুরু হয়ে গেল। স্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে তিনি বীরসিংহ গ্রামেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করবেন স্থির করলেন।

ঠাকুরদাসের ইতিমধ্যে বিবাহের বয়স হল। রামকান্ত তর্কবাগীশ নামক একজন নৈয়ায়িকের কন্যা ভগবতী দেবীকে তাঁর পিতা বধূ মনোনীত করলেন। যথাসময়ে ঠাকুরদাস ও ভগবতী দেবীর বিবাহ হয়ে গেল, এবং এই বিবাহের উপর দেবতার আশীর্বাদের মত ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তাঁদের প্রথম সন্তান ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হল।

ঈশ্বরচন্দ্রের পাঁচ বৎসর বয়স হবার পর তাঁকে লেখাপড়া শেখাবার ভার কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামক এক শিক্ষককে দেওয়া হল। গ্রামে ইনি একটি পাঠশালা পরিচালনা করতেন। এই স্থানীয় শিক্ষকটির যা-কিছু শেখাবার ছিল ঈশ্বরচন্দ্র পিতামাতাকে অত্যন্ত খুশী করে দিয়ে তিন বৎসরের

মধ্যেই তার সমস্তু শিখে নিলেন। তখন তাঁর পিতা উচ্চতর শিক্ষার জন্যে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাবেন, মনস্থ করলেন।

কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলে শিবচরণ মল্লিকের বসতবাড়ী সংশ্লিষ্ট একটি প্রাইমারী স্কুলে ঈশ্বরচন্দ্রকে ভর্তি করে দেওয়া হল। কিন্তু কয়েকমাস পরেই খুব শক্ত একটা অসুখ হওয়ায় তাঁকে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। অসুখটা সারবার পর তাঁকে পুরোদস্তুর একটা ভাল স্কুলে ভর্তি করবার কথা তাঁর পিতা খুব গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন। এজন্য এমন একটা সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছিল যা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বছর-দশেকেরও বেশী হল হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়েছে, এবং ইংরেজী শিক্ষা ক্রমশঃই বেশী করে জনপ্রিয় হয়ে চলেছে। অন্যদিকে আবার, পুরনো রীতির মোহ কাটাতে না পেরে, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অল্পদিন হল সংস্কৃত বিদ্যার নানা শাখায় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেছেন। সমাজের প্রগতিবাদী মানুষদের অনুমোদিত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা লাভ তাঁর লক্ষ্য হবে, না প্রাচীন পদ্ধতি অনুযায়ী সংস্কৃতশিক্ষার পথে তিনি যাবেন?

এই ব্যাপারে একটি চিন্তাই ঠাকুরদাসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। পুত্রদের মধ্যে দিয়ে পিতারা নিজেদের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাগুলিকে পরিতৃপ্ত করবার চেষ্টা করছেন এরকম দৃষ্টান্ত একেবারেই বিরল নয়। সংস্কৃত অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ঐতিহ্যের মধ্যে মানুষ হয়ে, তাঁর মনোগত বাসনা ছিল, নিজের শিক্ষা সমাপ্ত করে একটি চতুষ্পাঠী পরিচালনা করবেন। কিন্তু সংসারের নানা প্রয়োজনের তাগিদে এটা সম্ভব হয়নি। এই জন্যেই তাঁর এই ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হল যে, তাঁর পুত্র সংস্কৃত শিক্ষার পথেই যান, যাতে নিজের শিক্ষালাভ শেষ হলে তিনি স্বগ্রামে একটি চতুষ্পাঠী খুলে পূর্ব-পুরুষদের মত সংস্কৃতের অধ্যাপনা করতে পারেন।

এটা ভাগ্যের কথা বলতে হবে, যে, এই সঙ্কট কালে, মধুসূদন বাচস্পতি নামক ঈশ্বরচন্দ্রের মাতার একজন আত্মীয় ঈশ্বরচন্দ্রের হয়ে মধ্যস্থতা করে এমন একটি মীমাংসার কথা বললেন যাতে দুদিকই বজায় থাকে। তিনি নিজেই কিছুদিন আগে পর্যন্ত, নূতন যে সংস্কৃত কলেজটি খোলা হয়েছে, তার ছাত্র ছিলেন। তাই তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে এই কলেজে ভর্তি হতে পরামর্শ

দিলেন। সেখানে তিনি যে তাঁর পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী সংস্কৃত শিক্ষারই কেবল সুযোগ পাবেন তাই নয়, কলেজের পাঠসূচীর অনুপূরক ইচ্ছা-নির্ভর বিষয় হিসাবে প্রারম্ভিক ধরণের ইংরেজী শিখবার সুবিধাও তাঁর থাকবে। এই পরামর্শ সহজেই সকলের মনঃপূত হল, এবং ১৮২৯ সালের ১লা জুন ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ-বিভাগের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র হয়ে ভর্তি হলেন।

মহৎ সম্ভাবনার লক্ষণযুক্ত এই বালকটির ভবিষ্যৎ কর্ম-জীবনের রূপ কি হবে, তার অনেকখানি এই সিদ্ধান্তের দ্বারা নিরূপিত হয়ে গেল। সুতরাং এর তাৎপর্য ঠিকমত উপলব্ধি করবার চেষ্টা করা ভাল। তিনি যদি হিন্দু কলেজে ভর্তি হতেন, হয়ত তাঁর পক্ষে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির আত্তীকরণ সম্ভব হত, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে সংরক্ষিত তাঁর স্বজাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর যোগ থাকত না। অপর দিকে, শুদ্ধমাত্র সংস্কৃত শিক্ষাকেই যদি তিনি নিজের লক্ষ্যবস্তু করতেন, তাহলে তিনি সংস্কৃতে খুব একজন বড় পণ্ডিত হতে পারতেন, কিন্তু তাঁকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন একটা জীবন যাপন করতে হত, এবং ইংরেজী সাহিত্য যার প্রতীক স্বরূপ সেই নূতন প্রাণোচ্ছল সতেজ সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক থাকত না। সেই যুগ-পরিবর্তনের মুখে নিজের ঠিক ভূমিকাটি নিয়ে কাজ করতে হলে একজন প্রতিভাবান্ মানুষের দুরকম শিক্ষালব্ধ জ্ঞানেরই বিশেষ প্রয়োজন ছিল। দুটি সংস্কৃতির সঙ্ঘর্ষের ফলে ভারতবর্ষের যা পাওয়া ভাগ্যে ছিল তা হল দুটি সংস্কৃতির মিশ্রণ, একটির দ্বারা অন্যটির অপসারণ নয়। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর নিজের জীবনে এই দুই সংস্কৃতির মিলনের জন্যে যে মূল্যবান্ কাজ করে যেতে পেরেছেন তার অনেকখানিই সম্ভব হয়েছে, ইংরেজী এবং সংস্কৃত এই দুই ধারারই শিক্ষার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন বলে।

অল্পদিনের মধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্র মেধাবী ছাত্র হিসাবে বৈশিষ্ট্য অর্জন করলেন। দুই বৎসর অতীত না হতেই তিনি একটি বৃত্তি লাভ করলেন এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ব্যাকরণ বিভাগের সমস্ত অধীতব্য বিষয়ের অধ্যয়ন তাঁর সমাপ্ত হয়ে গেল। ঐ বৎসর তাঁকে সাহিত্য বিভাগে ভর্তি করা হল, এবং আর দুই বৎসরে ঐ বিভাগেরও অধ্যয়ন পর্ব তিনি সমাপ্ত করলেন। বহু সংখ্যক বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থ অধীতব্য বিষয়ের মধ্যে ছিল।

এর পরের বৎসর অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাধা হল। তার পরের দুই বৎসর অতিবাহিত হল বেদান্ত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্যে। স্মৃতিশাস্ত্রের পাঠসূচী নিয়ে অধ্যয়ন শুরু হল ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে। সব ক'টি বিষয়ের প্রান্তিক পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র যোগ্যতার বিচারে প্রথম স্থান অধিকার করলেন, কেবল স্মৃতিশাস্ত্রের পরীক্ষায় তাঁর স্থান হল দ্বিতীয়। সংস্কৃত সাহিত্যের সবক'টি শাখায় তাঁর এই ব্যাপক অধ্যয়ন, স্বদেশের প্রাচীন আদর্শস্থানীয় সাহিত্যের উপর তাঁর যে অসাধারণ অধিকার এনে দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার মাত্র দুই বৎসর পরে, ১৮২৭ সালে, পাঠসূচীতে একটি অভিনবত্ব প্রবর্তিত হল। সংস্কৃতের নির্দ্ধারিত পাঠক্রমগুলির সঙ্গে, যুগধর্মের সঙ্গে তাল রেখে, একটি ইচ্ছা-নির্ভর ইংরেজী পাঠক্রম জুড়ে দেওয়া হল, যাতে ছাত্রদের অভিরুচি হলে তারা ইংরেজী শিক্ষারও সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। ঈশ্বরচন্দ্র স্থির করলেন, তিনি এই সুযোগ পুরোপুরিই গ্রহণ করবেন এবং ১৮৩০ সালের পর থেকে সংস্কৃত বিভাগগুলির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী বিভাগেও অধ্যয়ন করতে লাগলেন। ইংরেজী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকটি ছিলেন এম. ডব্লিউ. ওয়ালাস্টন নামক একজন ইংরেজ। দুঃখের বিষয়, এই বিভাগটি ১৮৩৫ সালে তুলে দেওয়া হয়, অবশ্য ততদিনে ঈশ্বরচন্দ্র কাজচলা গোছের জ্ঞান আহরণ করার মত যথেষ্ট সময় ধরে ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ পেয়ে গিয়েছেন। এ থেকেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল তাঁর সম্মুখে।

সংস্কৃতে পারদর্শী ছাত্রদের 'হিন্দু ল অফিসার' বা হিন্দুদের আইন বিষয়ে উপদেষ্টা কর্মচারীর একটি সরকারী চাকরি পাবার সুযোগ ছিল। এই কর্মচারীদের কাজ ছিল, বিভিন্ন আদালতের সঙ্গে যুক্ত ইউরোপীয় বিচারকদের হিন্দু-আইন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া। এই কাজের যোগ্যতা প্রমাণের জন্যে, ১৮২১ সালের একাদশ রেগুলেশনের শর্ত অনুযায়ী হিন্দু ল কমিটি পরিচালিত একটি পরীক্ষা কর্মপ্রার্থীদের পাশ করতে হত। যুবক ঈশ্বরচন্দ্রের এটি একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বানের মত মনে হল; এবং এ আহ্বানে তিনি সাড়া দেবেন স্থির করলেন, একটা ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় যোগ দেবার মনোভাব নিয়ে যতটা, মনেপ্রাণে একটা চাকরি জোগাড়ের চেষ্টা হিসাবে ততটা

নয়। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন-রত অবস্থাতেই, ১৮৩৯ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষা তিনি দেন এবং এতে উত্তীর্ণ হন। তখনো তাঁর কুড়ির নীচে বয়স।

তাঁর আত্মশ্লাঘার পরিপোষক হবার যোগ্য যে সার্টিফিকেটটি কমিটি এই উপলক্ষে তাঁকে দিয়েছিলেন, সেটি এইরূপ:

"এটা প্রতিপন্ন হয়েছে এবং ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু আইন বিষয়ে অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী, এবং সেই হেতু ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত এবং বিচারাধিকার-সম্পন্ন যে-কোনো আদালতে হিন্দু আইন সংক্রান্ত বিষয়ে উপদেষ্টার পদ লাভের উপযুক্ত।"

পরীক্ষা কমিটির প্রেসিডেন্ট এইচ. টি. প্রিন্‌সেপ এবং কমিটির একজন সদস্য টি. এন. আই. আউসবি এই প্রশংসাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন।

একই বৎসরে তিনি ন্যায়শাস্ত্র এবং জ্যোতিষ এই দুটি পাঠ-বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৮৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে দুটি বিভাগেরই পাঠ সমাপ্ত করেন। এই ভাবে তাঁর কলেজের ছাত্রজীবন শেষ হয়।

কিন্তু কলেজের এই ছাত্রজীবন শেষ হবার আগেই, ছাত্র হিসাবে তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি এবং তাঁর ধীশক্তি সম্বন্ধে শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ সংস্কৃত কলেজ তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ধরে নেওয়া যায় যে, ছাত্র হিসাবে তিনি এমন অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন যে, এইরকম অসাধারণ আচরণই তাঁর প্রাপ্য ছিল। এটা উল্লেখযোগ্য যে, যখন তিনি বেদান্ত বিভাগের ছাত্র, তখনই একবার, ব্যাকরণ বিভাগে অধ্যাপনার জন্য একটি অস্থায়ী পদে দুমাসের জন্যে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর সম্বন্ধে যে কি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন এর মধ্যে তার পরোক্ষ প্রমাণ রয়েছে। তখন তাঁর পূরো আঠারো বৎসরও বয়স নয়।

তাঁর ছাত্রজীবনের প্রোজ্জ্বল কৃতিত্বের যোগ্য পুরস্কার স্বরূপ কলেজের অধ্যাপকেরা তাঁকে একটি প্রশস্তি-পত্র প্রদান করেন। তাঁদের হয়ে কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত ১৮৪১-এর ৪ঠা ডিসেম্বর এটি স্বাক্ষর করেন। এতে বলা হয়েছিল, ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্তদর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষ এবং শাস্ত্রীয় আচারানুষ্ঠান সংক্রান্ত

বিধিবিধান, বিদ্যার এই সব ক'টি শাখাতেই যথোপযুক্ত পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন।[১]

এটা বলতে বাকী থেকে গেছে যে, তখনকার দিনের রীতি অনুযায়ী ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা চোদ্দ বৎসর বয়সেই তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন। মেদিনীপুর জেলার ক্ষীরপাই গ্রামের শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী দিনময়ী দেবীকে তিনি পুত্রবধূরূপে নির্বাচন করেছিলেন।

ভারতবর্ষে চাকরিতে নিয়োগ করবার জন্যে যে-সব ইউরোপীয়দের নিয়ে আসা হত, তাদের কর্মোপযোগী শিক্ষা দেবার জন্যে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতায় একটি কলেজ স্থাপন করেছিলেন। এটির নাম দেওয়া হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। হিন্দুদের এবং মুসলমানদের আইন সহ সব আইন এবং বাংলা ভাষার অধ্যাপনা ছিল এই কলেজের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। ১৮৪১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর ৫০ টাকা মাসিক বেতনে ঈশ্বরচন্দ্রকে এই কলেজের সেরেস্তাদার নিযুক্ত করে, প্রথম পণ্ডিতের স্থান দিয়ে, এই ইউরোপীয় ভাবীকর্মচারীদের বাংলা ভাষা শেখাতে দেওয়া হয়।

এই কাজে নিযুক্ত থাকার সময়ে তিনি নিজের ইংরেজী বিদ্যাকে ঝালিয়ে নেবার সাধুসঙ্কল্প গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালাভের প্রতি তাঁর আগ্রহের পরিমাপ স্বরূপ তিনি প্রত্যহ অফিসের কাজের পর নিয়মিত ঐ বিষয়ের পাঠ নিতেন।

পাঁচ বৎসর পর, সংস্কৃত কলেজের সহকারী সেক্রেটারির কাজ পেয়ে এই কলেজ যখন তিনি ছাড়লেন, তখন ইংরেজী ভাষা তাঁর এতটাই দখলে এসেছে যে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেক্রেটারি, জি টি মার্শাল, বিদ্যাসাগরের দরখাস্তের সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে এ বিষয়ে একটি সুপারিশ পত্র পাঠিয়েছিলেন। এই পত্রটিতে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, যে, বিদ্যাসাগর "ইংরেজী ভাষায় উল্লেখযোগ্য জ্ঞান অর্জন করেছেন", এবং সেই সঙ্গে সাধারণ ভাবে সুপারিশ-সূচক নিম্নোক্ত কথাগুলি জুড়ে দিয়েছিলেন: "আমার ধারণা, এঁর মধ্যে অসাধারণ পরিমাণে, ব্যাপক ধরণের জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, শ্রমশীলতা, সুন্দর স্বভাব এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধার যোগ্য নৈতিক চরিত্রের একত্র সম্মিলন ঘটেছে।"

১। এতস্বৈতেষু শাস্ত্রেষু সমীচীনা ব্যুৎপত্তিরজনিষ্ঠ।

যাই হোক, বিদ্যাসাগর কিন্তু খুব বেশী দিন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সেক্রেটারির পদে স্থায়ী হতে পারলেন না। সেক্রেটারি রসময় দত্তের সঙ্গে তাঁর বনিবনাও হচ্ছিল না। ১৮৪৭ সালের ১৬ই জুলাই তিনি এই কাজে ইস্তফা দেন।

প্রায় দেড় বৎসর তাঁর বেকার অবস্থায় কাটল। এই স্বল্প সময়ও কিন্তু তিনি অপচয়িত হতে দিলেন না। কালক্ষেপণের উপায় হিসাবে পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এল। তিনি 'সংস্কৃত প্রেস' এবং 'প্রেস ডিপজিটরি', পরস্পরের সহায়ক এই দুটি ব্যবসার পত্তন করেন। প্রেস থেকে বাংলা ও সংস্কৃত বই ছেপে প্রকাশ করা হত, এবং অন্য প্রতিষ্ঠানটি সে বই মজুত রেখে বিক্রি করে কমিশন পেত। তাঁর পরবর্তী জীবনে এই দুটি ব্যবসা খুব লাভজনক হয়ে উঠেছিল। তাঁর বেশীর ভাগ অর্থাগম এদের থেকেই হত এবং তাঁর অগণিত দান-দাক্ষিণ্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও এরাই জোগাত, যার ফলে 'দয়ার সাগর' আখ্যাতে তিনি বিশেষিত হয়েছিলেন।

ছেপে প্রকাশ করবার জন্যে বইয়ের জোগান অব্যাহত রাখবার উদ্দেশ্যে নিজে বই লিখবার সুন্দর কল্পনাটি তাঁর মনে উদিত হল। এই সূত্রে প্রথম যে বইটি তিনি লিখলেন সেটি হল বাংলায় ভাষান্তরিত সংস্কৃত সাহিত্যের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। পরের বৎসর বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস লিখলেন একটি। এরপর বই লেখার প্রতি তাঁর যেন একটা আসক্তি জন্মে গেল, এবং তখনকার দিনের একজন লোকহিতব্রতী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসাবে নানাপ্রকারের কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও চিত্তবিনোদনের উপায় স্বরূপ এই কাজটি তিনি চালিয়ে যেতে লাগলেন।

১৮৪৯ সালের গোড়ার দিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের 'হেড রাইটার এণ্ড ট্রেজারার' বা প্রধান কেরানী ও খাজাঞ্চির কাজটি খালি হয়, এবং সেই বৎসরের ১লা মার্চ থেকে বিদ্যাসাগরকে এই কাজটিতে নিয়োগ করা হয়। যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তিনি প্রথম চাকরিতে ঢুকেছিলেন, তার সঙ্গে এইভাবে তাঁর সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হল। কিন্তু এটাও বেশীদিন চলল না। আরও গুরুতর দায়িত্বের ডাকে তাঁকে সংস্কৃত কলেজে ফিরে যেতে হল, ১৮৫০এর ৫ই ডিসেম্বর থেকে সংস্কৃত সাহিত্যের লেক্‌চারারের কাজ নিয়ে। ছ'মাস না কাটতেই তিনি মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে কলেজের প্রিন্সিপালের কাজে নিযুক্ত হলেন।

এই দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ করে তিনি নিজে যে-কলেজে শিক্ষালাভ করেছিলেন তাকে এমন করে গড়বার সুযোগ পেলেন, যাতে প্রতিষ্ঠানটি কৃতকার্যতার দিক্ দিয়ে আগের চেয়ে বেশী সার্থক হতে পারে। দশ বৎসরেরও বেশী সময় নিজে এই কলেজের ছাত্র ছিলেন বলে এর দোষত্রুটিগুলি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল। তাই যত শীঘ্র পারলেন তিনি পর পর এমন কতগুলি সংস্কার সাধন করলেন, যাতে তাঁর মনে হল, প্রতিষ্ঠানটির কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের দেশের ইতিহাসের একটি যুগসন্ধিক্ষণে এটি নানাপ্রকারের প্রয়োজন মিটাতে পারবে। এ সমস্তেরই প্রেরণা এসেছিল তাঁর এই আকাঙ্খার থেকে যে, এটিকে বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে পুনর্গঠিত করে এমন কার্যোপযোগী করে তুলবেন, যাতে অবহেলিত শ্রেণীর মানুষদের জন্যেও এর দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে, ন্যূনাধিক পরিমাণে পরিপূর্ণ শিক্ষা দেওয়ার কাজে একে ব্যবহার করা যায়।

পূর্বে দেশীয় শিক্ষায়তনগুলিতে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী শুক্ল এবং কৃষ্ণ-পক্ষের প্রথম এবং অষ্টম দিনে কলেজটি বন্ধ থাকত। এই প্রথার দুটি অসুবিধা ছিল। প্রথমতঃ, রবিবারগুলিকে ছুটির দিন বলে গণ্য করার নবপ্রচলিত নিয়মের সঙ্গে এর অমিলের দরুণ কার্যপরিচালনা সংক্রান্ত নানা সমস্যার উদ্ভব হত। দ্বিতীয়তঃ, চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল বলে কবে যে ছুটির দিন পড়বে তার কিছু স্থিরতা ছিল না, এবং প্রায়শঃই পূর্বে অনুমিত দিন থেকে আগে-পরে হয়ে যেত। এজন্য একটি নির্দ্ধারিত সময়সূচী তৈরী করা কঠিন হত, এবং তার ফলে অসুবিধা হত বিস্তর। ঈশ্বরচন্দ্র তাই পুরাতন প্রথার অবসান ঘটাবেন স্থির করলেন এবং যে-সব স্কুলে ইংরেজী শেখান হত তাদের জন্যে রবিবারগুলিকে ছুটির দিন রূপে পালন করার নব-প্রবর্তিত প্রথা অবলম্বন করলেন।

শুরুতে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার হিন্দুদের দুটি উচ্চতম বর্ণ, ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পক্ষপাতদুষ্ট মনে হওয়াতে তিনি এই নিয়মটি উঠিয়ে দিলেন। কলেজে প্রবেশের অধিকার বর্ণ-নির্বিশেষে সমস্ত শিক্ষিত শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে প্রসারিত করে দেওয়া হল। ভর্তি হবার নিয়মটি এইভাবে সংকীর্ণতা-মুক্ত হল এবং কলেজের দ্বার সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্যে উন্মুক্ত হয়ে গেল।

এতদিন কলেজে যে সব ছাত্র ভর্তি হত তাদের কাছ থেকে কলেজে পঠন-পাঠনের জন্যে বেতন বলে কিছু নেওয়া হত না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে, মনস্তত্ত্বের বিচারে এই নিয়মটি যুক্তি-বিরুদ্ধ। মূল্য না দিতে হলে মানুষ উপকার যা পায় তার মূল্য বোঝে না, আর সেই কারণেই সেই উপকার পাওয়া সম্বন্ধে তার তেমন আগ্রহও থাকে না। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, যে, বিনা-বেতনে শিক্ষালাভের এই বিশেষ সুবিধাটি পাবার জন্যে অনেক ছেলে ছাত্র হিসাবে নাম লেখাত, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নিয়মিত ক্লাস করা নিয়ে মাথা ঘামাত না। ফলে তাদের ক্লাসে উপস্থিতি একেবারেই সন্তোষজনক ছিল না। বিদ্যাসাগর এই বিশেষ সুবিধাটি প্রত্যাহার করে নিলেন। নিয়ম করা হল, ১৮৫৪ সাল থেকে ভর্তি হবার জন্যে দু'টাকা এবং পঠন-পাঠনের জন্যে মাসে একটাকা করে বেতন দিতে হবে। তাঁর প্রবর্তিত এই নূতন নিয়ম থেকে যে সুফল পাওয়া গেল তাইতেই তার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হল।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কলেজে কিছুদিনের জন্যে একটি নূতন বিভাগ খুলে, যে-সব ছেলেরা ইংরেজী শিখতে আগ্রহী তাদের জন্যে একটি ইচ্ছা-নির্ভর ইংরেজী পাঠক্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিদ্যাসাগর নিজে এই ব্যবস্থাটিকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৮৩৫ সাল থেকে এই বিভাগটি তুলে দেওয়া হয়। বিদ্যাসাগর ইংরেজী শিক্ষাকে খুব বেশী মূল্য দিতেন এবং বিশ্বাস করতেন, যে, পুরাতন পদ্ধতিতে যে-সব ছাত্ররা সংস্কৃতে শিক্ষালাভ করে, তাদেরও এর সাহায্যে নিজেদের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করার প্রয়োজন আছে। এ না হলে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার দ্বারা পরিপুষ্ট অধিকতর প্রাণশক্তি-সম্পন্ন যে সংস্কৃতি, তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের এক প্রান্তে পড়ে থাকতে হবে। তাঁর নিজের বেলায় যেমন দেখা গেছে, একটা মানুষকে সম্পূর্ণতা অর্জন করতে হলে এই দুই রকম শিক্ষারই তার প্রয়োজন আছে। সুতরাং তিনি স্থির করলেন, ১৮৫২ সাল থেকে বিভাগটি আবার খোলা হবে, কিন্তু এবারে বিষয়টি আর ঐচ্ছিক থাকবে না, হবে অবশ্যপাঠ্য। একই নীতি অনুসারে এর পরের বৎসর পাশ্চাত্ত্য গণিতেরও একটি পাঠসূচীর তিনি প্রবর্তন করলেন।

১৮৫৫ সালে কলেজটি পরিদর্শন করবার জন্যে বেনারস সংস্কৃত কলেজের

অধ্যক্ষ ডক্টর ব্যালান্টাইনকে কর্তৃপক্ষ আমন্ত্রণ করে আনেন। পরিদর্শনের পর যে রিপোর্ট তিনি দাখিল করেন, তাতে বিদ্যাসাগরের কাজের খুব সুখ্যাতি ছিল, কিন্তু কতগুলি পাঠ্য বইয়ের পরিবর্তে অন্য লোকের লেখা বই পাঠ্য করার সুপারিশও ছিল তাতে। এর থেকে, যে পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে এই সুপারিশ হয় তার গুণাগুণের বিচারে, কিংবা প্রস্তাবিত পরিবর্তন দেশের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হবে এই ভয়ে, সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করতে অস্বীকার করায়, যে এডুকেশন কমিটি সরকারী শিক্ষায়তনগুলি পরিচালনা করতেন তার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের একটি বিতর্কের সূত্রপাত হয়। এই বিষয়টি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার আমাদের প্রয়োজন নেই, কিন্তু বিশেষ তাৎপর্য হেতু একটি বই সম্বন্ধে কিছু বলা যেতে পারে।

ব্যালাণ্টাইন পরামর্শ দিয়েছিলেন, বিশপ বার্ক্‌লের 'Principles of Human Knowledge' বইটিকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হোক। বিদ্যাসাগর এর বিরুদ্ধতা করলেন এই বলে যে, এটা দেশের স্বার্থের পরিপন্থী হবে। তিনি যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন তা এই: বেদান্তের মতবাদ, যা অত্যন্ত বেশী ভাবমার্গের জিনিষ, এবং যা এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে মায়া বলে উড়িয়ে দেয়, তার দ্বারা ভারতবর্ষীয়দের মন পরিষিক্ত হয়ে আছে। তাঁর মতে এর প্রভাব জীবন সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে বাস্তব জীবনের প্রতি তাদের উদাসীন করে দিয়েছে। বার্ক্‌লের মতবাদ কতকটা এই ধরণের বলে তাঁর আশঙ্কা এই যে, জীবন সম্বন্ধে এই বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্ত্য দর্শন দ্বারা সমর্থিত হলে তাঁর দেশের লোকদের জাগতিক ব্যাপারে অগ্রগতির চেষ্টার প্রতি বিরূপতা বাড়বে। শেষ পর্যন্ত তর্কে বিদ্যাসাগরেরই জয় হল। মিঃ মুয়াটকে জোরাল ভাষায় লেখা একটি প্রতিবাদ-পত্র পাঠিয়ে তিনি দাবী জানালেন, যে-প্রতিষ্ঠানটির ভার তাঁকে দেওয়া হয়েছে তার আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপারে তাঁর কাজের স্বাধীনতা থাকবে। কর্তৃপক্ষ অবশেষে এই স্বাধীনতা তাঁকে দিতে রাজী হলেন।

১৮৫৪ সালে স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে বাংলাদেশের লেফ্‌টেনান্ট গভর্ণর নিযুক্ত হন। এই খ্যাতনামা সিভিলিয়ানটি বিগত জীবনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষানবিশি করার সময় বিদ্যাসাগরের খুব নিকট সংস্পর্শে এসেছিলেন। সেই সূত্রে তাঁর এই শিক্ষকটির চমৎকার গুণাবলীর কথা তাঁর

আগে থেকেই জানা ছিল। সুতরাং বাংলাদেশের স্কুলগুলিতে শিক্ষার মানের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে তাঁর নিজের কল্পিত একটি কার্যসূচীকে রূপায়িত করার জন্যে তিনি যে বিদ্যাসাগরের কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগাতে চাইবেন, এতে আশ্চার্যান্বিত হবার কিছু নেই। বিদ্যাসাগর প্রকল্পটিকে হাতে নিয়ে উপরি কাজ করে সেটিকে রূপ দিন, এই ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করলেন। কলেজের অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত থেকেই বিদ্যাসাগর দক্ষিণ বাংলার—নদীয়া হুগলী, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলা যার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে অনুমান হয়—স্কুলগুলির স্পেশাল ইন্স্পেক্টার বা বিশেষ পরিদর্শক নিযুক্ত হলেন। দুটি কাজের জন্যে তাঁর মিলিত বেতন মাসে ৫০০ টাকা করা হল।

শিক্ষার মান উন্নত করবার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে বিদ্যাসাগর তাঁর নিজস্ব একটি কর্মপন্থা অবলম্বন করলেন। তিনি স্থির করলেন, প্রত্যেক জেলাতে একটি করে আদর্শ স্কুল স্থাপন করবেন। এর উদ্দেশ্য, শিক্ষার যে মান নিয়ে এই স্কুলগুলিতে কাজ হবে, তাকে আদর্শ হিসাবে অন্য স্কুলগুলি ব্যবহার করবে, এবং এরা যে-সমস্ত নূতনত্বের প্রবর্তন করবে, অন্য স্কুলগুলিতেও সেগুলি অবলম্বিত হবে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন, ভাল শিক্ষক না পাওয়া গেলে আদর্শ স্কুল স্থাপন সম্ভব নয় এবং ভাল শিক্ষক পাওয়া খুবই দুষ্কর। কাজেই তাঁর কর্মপন্থার একটি পরিপূরক অঙ্গ হিসাবে, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্যে স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতে হল। এই স্কুলগুলির নাম দেওয়া হল নর্মাল স্কুল।

তিনি যে কিরকম মনপ্রাণ দিয়ে এই প্রকল্পটি নিয়ে কাজ করে গিয়েছিলেন, তা বোঝা যায়, এই কাজে যে সফলতা তিনি অর্জন করেছিলেন তার থেকে। তিনি যে জেলাগুলির ভার পেয়েছিলেন, তার প্রত্যেকটিতে ১৮৫৫ সালের জুলাই মাসের মধ্যে একটি করে আদর্শ স্কুল স্থাপিত হল। প্রশিক্ষণলব্ধ শিক্ষকের জোগান অব্যাহত রাখবার জন্যে নদীয়া, হুগলী, মেদিনীপুর এবং বর্দ্ধমান, এই চারটি জেলায় চারটি নর্মাল স্কুল খোলা হয়েগেল। মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যেও তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টা এবং উদ্যম কমপ্রশংসনীয় নয়। নিজের দায়িত্বে তিনি কম করেও পঁয়ত্রিশটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন; তার কুড়িটি হুগলী জেলায়, এগারোটি বর্ধমান জেলায়, তিনটি মেদিনীপুর জেলায় এবং একটি নদীয়া জেলায়। যেখানেই

প্রয়োজন হয়েছে, তিনি নিজের তহবিল থেকে টাকা ধার দিয়েছেন, যাতে স্কুল খোলা ত্বরান্বিত হয়। তাঁর নিজের পুঁজি থেকে এভাবে ধার দেওয়া টাকার অঙ্ক ছিল, ৩,৪৩৯।

উৎসাহে আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি একবারও ভাবেননি যে এ নিয়ে তিনি এমন একটা বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন যার ফল হবে সুদূর-প্রসারী। ১৮৫৪ সালে উড যে ডেস্‌প্যাচ বা সরকারী রিপোর্টটি দাখিল করেন তার ভিত্তিতে শিক্ষা বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোর কিছু পরিবর্তন হয়। বস্তুতঃ এদেশে এখন যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, এইতেই তার ভিত তৈরি হয়ে যায়। এই ডেস্‌প্যাচের সুপারিশ অনুযায়ী ভারতবর্ষে লণ্ডন ইউনিভার্সিটির আদর্শে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। 'ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন' পদটি প্রবর্তিত হল এবং এই পদাধিকারী এডুকেশন কমিটির কর্তব্য কর্মগুলির ভার নিলেন। ডব্লিউ গর্ডন ইয়ং সর্বপ্রথম ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন নিযুক্ত হলেন।

বিদ্যাসাগর যেরকম দ্রুতগতিতে স্কুল স্থাপন করে চলেছিলেন, দুর্ভাগ্য-ক্রমে এই তরুণ কর্মচারীটির সেটা মনঃপূত হল না। কিন্তু বিদ্যাসাগর নিজের পথ ছাড়তে রাজী হলেন না বলে দুজনের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। লেফ্‌-টেনাণ্ট গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে বিদ্যাসাগরকে সুনজরে দেখতেন বলে মাঝে পড়ে এই ঝগড়া মিটিয়ে দিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে নিজে যে টাকা ধার দিয়েছিলেন তা পরিশোধ করার প্রশ্ন নিয়ে ব্যাপার চরমে উঠল। অবস্থা এমন দাঁড়াল, যে, এর চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যে বোর্ড অব ডিরেক্টর্‌স্‌কে সমস্ত বিবরণ জানান হল। কোম্পানী শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরকে তাঁর টাকা ফিরিয়ে দেবেন স্থির করলেন, কিন্তু স্কুলগুলির অর্থ সাহায্য চালিয়ে যেতে রাজী হলেন না।

এই বিতর্ক দুজনের সম্পর্কটাকে এত বেশী তিক্ত করে দিল, যে, বিদ্যাসাগর তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করতে লাগলেন। ঊর্ধ্বতন কর্মচারী হিসাবে ইয়ং-এর স্থানটি ছিল সুবিধাজনক এবং তিনি যা করতে লাগলেন তাতে, মনের তৃপ্তি হয় এমনভাবে নিজের কাজগুলি করে যাওয়া বিদ্যাসাগরের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। স্বভাবতঃই কাজে তাঁর আর উৎসাহ রইল না, এবং তিনি পদত্যাগ করবেন স্থির করলেন।

তাঁর পদত্যাগ-পত্রে পদত্যাগের এমন কতকগুলি কারণের উল্লেখ ছিল, যাতে দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বয়ং লেফ্‌টেনান্ট্‌ গভর্ণরের সঙ্গেও তাঁকে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হতে হল। এই ব্যাপারেও এই আশ্চর্য মানুষটির মনের ভিতরকার সদ্‌গুণগুলি খুব স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেল। দেশের প্রশাসনের একেবারে শীর্ষ-স্থানীয় ব্যক্তিটিকে খুশী করবার জন্যেও তিনি নিজের নীতিবোধ থেকে উদ্ভূত মতবাদ ছাড়তে রাজী হলেন না। বিষয়টি একটু গভীরভাবে অনুধাবন করে দেখবার মত।

গর্ডন ইয়ং, ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন, এই ঠিকানায় পাঠানো তাঁর ৫ই আগস্ট, ১৮৫৮ তারিখের পদত্যাগ-পত্রে তিনি লিখেছিলেন: "এই সরকারী চাকরি সংক্রান্ত আমার সব কর্তব্য সম্পাদনের জন্যে আমাকে নিরন্তর যে মানসিক শ্রম করতে হয় তা আমার স্বাস্থ্যকে এত বেশী ভেঙে দিয়েছে, যে, আমাকে বাধ্য হয়ে বাংলাদেশের আনারেব্‌ল্‌ লেফ্‌টেনান্ট্‌ গভর্ণরের কাছে পদত্যাগ পত্র দাখিল করতে হচ্ছে।"

এটা লক্ষ্য করবার মত যে, চিঠিটির চতুর্থ প্যারাগ্রাফে তিনি এও লিখছেন:

"ছোট ছোট যে-সমস্ত কারণে আমাকে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে, আমার পদোন্নতির সব ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পরিসমাপ্তি, এবং বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে আমার মনের প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সমর্থনের অভাব, যে সমর্থন শিক্ষাবিভাগের প্রতিটি বিবেকী কর্মচারীর থাকা উচিত।" এরপর আরো যা লিখলেন, তার মধ্যে ছিল তাঁর এই মন্তব্য, যে, তিনি মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারছেন না এবং এতে তাঁর কর্ম-কুশলতার অবনতি হচ্ছে। তাছাড়া যে আবেষ্টনের মধ্যে কাজ করতে হয়, সেটা এমন যে, "অভীষ্ট বিষয়ে সততা বজায় রাখা যায় না," যা তাঁর মতে "বিবেকবুদ্ধি-সম্পন্ন সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে একটি অপরিহার্য সদ্‌গুণ।"

মনে হয়, তাঁর পদত্যাগ গ্রহণ করতেই কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে দাবী করলেন যে, বিদ্যাসাগর তাঁর চিঠিতে "ছোট ছোট" কারণ বলে উল্লেখ করে যে-সব মন্তব্য করেছেন সেগুলি তাঁকে প্রত্যাহার করতে হবে। এটা তাঁরা চাইছিলেন এই সহজবোধ্য কারণে, যে, এগুলির মধ্যে তাঁর অব্যবহিত উপরিতন কর্মচারী গর্ডন ইয়ং সম্বন্ধে এবং বিদেশী সরকারের মনোভাবের প্রতি নিন্দাসূচক কটাক্ষ ছিল। প্রথমে গর্ডন ইয়ং

চেষ্টা করলেন তাঁকে তাঁর পত্রের এই অংশগুলি প্রত্যাহার করতে রাজী করাতে, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হল না। বিদ্যাসাগর প্রকৃত অবস্থাটাকে চাপা দেবার বিরোধী ছিলেন। তিনি চাইছিলেন, যা সত্য তার সম্পূর্ণটিই নথিবদ্ধ হয়ে থাকুক। তাই তিনি ইয়ং-এর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন, কিন্তু ভদ্রতা জিনিসটা তাঁর মজ্জাগত ছিল বলে সেটা করলেন অত্যন্ত মার্জিত ভাষায়।

শাসন-ক্ষমতায় যাঁরা অধিষ্ঠিত তাঁদের স্বার্থ এর সঙ্গে জড়িত ছিল বলে ব্যাপারটা সর্বোচ্চ স্তরের কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা হল, যার ফলে আমরা দেখতে পাই, বাংলার তদানীন্তন লেফ্‌টেনান্ট্‌ গভর্ণর, স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে, যিনি কিছুকাল আগে পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের বন্ধু এবং মুরুব্বির মত ছিলেন, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে বিষম তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। স্বাস্থ্য ব্যতীত তাঁর পদত্যাগের অন্য কারণগুলি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যগুলি প্রত্যাহার করে নিতে তাঁকে হ্যালিডে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন ; কিন্তু পত্রটিতে কোনো অদলবদল করবেন না, তাঁর এই সিদ্ধান্তে অটল থাকবার সঙ্কল্প থেকে বিদ্যাসাগরকে বিচ্যুত করতে তিনিও ব্যর্থকাম হলেন।

বিষয়টি নিয়ে হ্যালিডে ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে চিঠিপত্রের বিনিময় হয়েছিল, সেগুলো সুখপাঠ্য নয়, তবে এদের ভালর দিক্ একটা এই আছে যে, এদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের মহৎ গুণাবলী খুব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। আর যাই হোক, কার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করা হবে এ নিয়ে প্রতিযোগিতা চলেছিল দেশের শীর্ষস্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং একজন অধস্তন কর্মচারীর মধ্যে,—সমানে সমানে নয়। কিন্তু সম্ভাব্যতার অতীত বলেই যেটাকে মনে হওয়া উচিত, তাই হল,—পরাজয় স্বীকার করতে হল কর্তৃপক্ষকেই। এটা হ্যালিডের দিক্ থেকে হল, শাসক-সম্প্রদায়ের মর্যাদার পক্ষে হানিকর। বিদ্যাসাগর এটাকে দেখেছিলেন এইভাবে, যে, সত্যের পক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়ে যে-কোনো মূল্য দিয়ে তার মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

পত্রের আপত্তিজনক অংশগুলি বাদ দেবার জন্যে হ্যালিডের কাছ থেকে যখন অনুরোধ এল, তখন বিদ্যাসাগর এই বলে তার উত্তর দিলেন : "সম্যক্ বিবেচনার পর আমি দেখলাম যে, আমার পত্রের যে অংশগুলি আপনার

আপত্তিকর মনে হচ্ছে, পূর্বাপর সঙ্গতি বা ঔচিত্য এর কোনোদিক্‌কার বিচারেই সেগুলি বর্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা সত্য যে, আমার ভগ্নস্বাস্থ্যই একটা প্রধান কারণ যা আমাকে পদত্যাগে প্রবৃত্ত করেছে, কিন্তু আমার বিবেকের কাছে খাঁটি থেকে আমি একথা বলতে পারি না যে, এটাই তার একমাত্র কারণ। তাই যদি হত, ত আমি আমার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে দীর্ঘকালের ছুটির আবেদন করতে পারতাম।"[১]

নিজের স্বভাবসিদ্ধ হৃদ্যতার সঙ্গে তিনি এই বলে শেষ করলেন, "আমি যখন আপনার কাছে শুনলাম যে আমার বিতর্কিত পত্রাংশ থেকে হয়ত আপনার কিছু অসুবিধার উদ্ভব হতে পারে, তখন আমি যে গভীর অনুশোচনা অনুভব করেছি তার সীমা নেই। কিন্তু আমি যখন ভাবি যে, এমন কোনো অনিচ্ছিত কারণ আমি ঘটিয়েছি, যাতে আপনার বিন্দুমাত্র অশান্তি বা অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে তখন আমি যে নিদারুণ বেদনা বোধ করি তা ভাষায় অবর্ণনীয়।"

বিতর্ক এইখানেই কিন্তু শেষ হয়ে গেল না। এরপর আরও পত্রবিনিময় হল দুজনের মধ্যে। ব্যাপারটার শেষ নিষ্পত্তি হল ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শনকে লিখিত বাংলা সরকারের জুনিয়র সেক্রেটারির ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ তারিখের একটি চিঠিতে, যাতে তিনি জানালেন, যে, সরকার বিদ্যাসাগরের পদত্যাগ গ্রহণ করবেন স্থির করছেন। এই আদেশ অনুসারে ১৮৫৮ সালের ৩রা নবেম্বর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদের কর্মভার তাঁর কাছ থেকে নিয়ে কাওয়েল তাঁকে অব্যাহতি দিলেন। এইভাবে তখন একটি দুঃখজনক অধ্যায়ের অবসান হল। কিন্তু এই সূত্রে বিদ্যাসাগরের নৈতিক চরিত্রের যে মহনীয়তা প্রত্যক্ষগোচর হল, সেটি হল প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রামে তাঁর একটি অতিরিক্ত অস্ত্রের মত। হয়ত এরকমটা যে ঘটবে দেশের ভাগ্যে সেটা লেখা ছিল তার মঙ্গলেরই জন্যে। তাঁর সম্মুখে একটা বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র খুলে গেল তাঁর সহজাত কর্মক্ষমতার সদ্ব্যবহারের জন্যে। বৈরীভাবাপন্ন একজন উর্ধ্বতন কর্মচারীর অধীনে চাকরিতে নিযুক্ত থেকে ততটা হওয়া সম্ভব ছিল না।

তাঁর মনের কাছে মাতৃভাষার সেবার চেয়ে প্রিয়তর কাজ আর

১। এফ. আই. হ্যালিডেকে লেখা ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮ তারিখের চিঠি।

কিছু ছিল না। তাঁর দুর্ভাগ্য, অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর নৈপুণ্য, বিশেষতঃ প্রতিষ্ঠানাদি পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর কর্মকুশলতা সর্বদাই এদিক্ থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করে রেখেছে। যা ঘটছিল তা এই, তখনকার দিনের প্রশাসনিক সংগঠনের মধ্যে যাঁরা কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁরা তাঁর কর্মক্ষমতার পরিচয় পেয়ে গিয়েছিলেন, এবং সেটাকে শিক্ষাবিভাগ পরিচালনা ও তার উন্নতি সাধনের জন্যে ব্যবহার করতে চাইছিলেন। যে কাজটিকে তিনি হৃদয় দিয়ে সব চেয়ে বেশী ভাল বাসতেন সেটিতে নিজের কর্মশক্তি নিয়োগের সুযোগ তিনি প্রথম পেয়েছিলেন, যখন তিনি সংস্কৃত কলেজে তাঁর অব্যবহিত উপরিতন কর্মচারী, সেক্রেটারির সঙ্গে বেবনিবনাও হেতু কলেজের এ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারির কাজে ইস্তফা দিয়েছিলেন। এটা ১৮৪৭ সালের জুলাই মাসের কথা। তখন থেকে শুরু করে ১৮৪৯ সালের গোড়ার দিক্ পর্যন্ত, যখন তাঁকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের একটি চাকরিতে নেওয়া হয়, তিনি যে ক'টা দিন স্বাধীন জীবন যাপন করতে পেরেছিলেন তা তাঁর নিজের মনোমত এই সমস্ত কাজেই ব্যয়িত হয়।

এই স্বল্পকালস্থায়ী অবাধ অবকাশটিকে তিনি যে কি সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন, তা এই পরিচ্ছেদটির গোড়ার দিকে বর্ণিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের উন্নতি বিধানের জন্যে তাঁকে যে কেবল গ্রন্থরচনা করতে হয়েছিল তা নয়, সেই সব গ্রন্থের প্রকাশন এবং বিক্রয়ের সুসংগঠিত উপায় উদ্ভাবনও করতে হয়েছিল। এজন্যে পাকা ব্যবসায়ীর মত তিনি পরস্পরের পরিপূরক দুটি সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন ; তার একটি সংস্কৃত প্রেস, বই ছেপে প্রকাশ করার জন্যে ; অন্যটি প্রেস ডিপজিটরি, সেগুলি বিক্রয় করার জন্যে। তিনি যে কেবল নিজেই বই লিখতেন তা নয়, সহজাত-শক্তি সম্পন্ন লেখকদের পুস্তক রচনায় উৎসাহিত করতেন, যাতে তাঁদের রচিত পুস্তক তিনি ছেপে প্রকাশ করতে পারেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নাম করা যেতে পারে। এঁর কবিতা লেখায় হাত ছিল। এঁকে বলে কয়ে রাজী করিয়ে 'শিশুপাঠ' নাম দিয়ে শিশুদের উপযুক্ত একটি গ্রন্থমালা তিনি রচনা করিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে এগুলিই ছিল শিশুদের পাঠের উপযোগী প্রথম পুস্তক।

সুতরাং এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, তিনি যখন সরকারী চাকরিতে

ইস্তফা দেবার কথা গভীর ভাবে ভাবছিলেন, তখন তাঁর মাতৃভাষার পরিচর্যার জন্যে অখণ্ড অবকাশ যে তিনি পাবেন, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার এই ছবিটিই তাঁর মনে সবচেয়ে বড় হয়ে জাগছিল আর এইজেই বোধ হয় তাঁর মনের দাঁড়ি-পাল্লায় তাঁর পদত্যাগের সঙ্কল্পের দিক্‌টাকে বেশী ভারী করেছিল। সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর নিজের জন্যে এই কর্মসূচীই যে তিনি নির্দ্ধারিত করে রেখেছিলেন, তা তাঁর পদত্যাগ পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশটির থেকে বোঝা যাবে : "আমার নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হওয়া মাত্রই আমার সময় এবং সামর্থ্য বাঙালীদের মাতৃভাষায় নানারকম প্রয়োজনীয় বিষয়ের গ্রন্থ-রচনা ও গ্রন্থ সঙ্কলনের কাজে নিয়োগ করব, এই আমার অভিপ্রায়।"

এই সময়টিতেই তিনি, বাল্মীকির তপোবনে সীতার নির্বাসিত জীবনের কাহিনী নিয়ে লিখিত ভবভূতির সংস্কৃত নাটকের উপর ভিত্তি করে তাঁর সর্বাপেক্ষা বেশী জনপ্রিয় ও বিখ্যাত গ্রন্থ 'সীতার বনবাস' রচনা করেন। এই বইটি ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়। আবার এই সময়টিতেই তিনি সুবিখ্যাত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থগুলির সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজ আরম্ভ করেন। এদের মধ্যে কালিদাসের কুমারসম্ভবম্, মেঘদূতম্, এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, সাহিত্যের এই রত্নগুলিও ছিল। এইগুলি বিশেষ করে মূল্যবান্ হয়েছিল এই কারণে যে, তিনি বহুক্লেশ স্বীকার করে, ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুঁথির পাঠ তুলনামূলক ভাবে বিচার করে গ্রন্থগুলির মূল পাঠ কি ছিল তা স্থির করেছিলেন। যেখানে পুঁথিগুলির পাঠে পার্থক্য দেখা যেত, সেখানে তিনি সেগুলিকে সতর্কতার সঙ্গে বিচার করে দেখতেন, এবং এমন একটি পাঠ নির্বাচন করে গ্রহণ করতেন, যেটির সঙ্গে তাঁর বিবেচনায় টীকাকারদের দ্বারা সম্পাদিত মূল পাঠের সঙ্গতি সবচেয়ে বেশী।

তাঁর কর্মশক্তির প্রাচুর্যকে কাজের কোনো একটি বিশেষ খাতে বেঁধে রাখা গেল না। সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও তিনি একসময় দেখতে পেলেন যে, তিনি অন্য রকমের কর্মপ্রচেষ্টাতেও জড়িত হয়ে পড়েছেন। তাঁর চিত্তবিক্ষেপের প্রধান কারণগুলির অন্যতম ছিল, হিন্দু নারীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে সমাজে তাদের স্থানকে উন্নততর করবার জন্যে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ। এটি ছিল, যাকে

বলা যায়, তাঁর একটি পুরাতন প্রেম। যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তখনই তিনি বৈধব্যের পর হিন্দু নারীদের পুনরায় বিবাহ করবার অধিকার জোর করে আদায় করার জন্যে হিন্দুসমাজের মধ্যে তার যে অংশটি প্রাচীনপন্থী তার সঙ্গে অদম্য দৃঢ়তা নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় ১৮৫৬ সালে সরকার আইন প্রণয়ন করে হিন্দু বিধবাদের এই অধিকার প্রদান করেন। এর পরেকার একটি পরিচ্ছেদে এই বিষয়টি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা যাবে।

বাঙালী ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহু-বিবাহের প্রচলন ছিল অন্য একটি সমস্যা এর মর্ম যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হলে তখনকার দিনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সংক্রান্ত কিছু তথ্য পাঠকের পাওয়া দরকার। এমন একটা সময় এসেছিল যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল বাংলা দেশে, এবং সেখানে কয়েক শতাব্দী ধরে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য চলছিল। আদিশূর বাংলা দেশে রাজা হয়ে রাজ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে আগ্রহান্বিত হলেন। তাঁর সময়কার ব্রাহ্মণেরা তাঁদের বংশগত সংস্কৃতি থেকে এতটাই তখন বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিলেন যে অপরিহার্য বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানগুলিও তাঁরা ভুলে বসেছিলেন। জাতিভেদের বিচারে বিভিন্ন ধর্মের স্ত্রীপুরুষের বিবাহ সংক্রান্ত বিধিনিষেধগুলি মান্য করা বিষয়েও তাঁরা খুব অবহিত ছিলেন না।

প্রথম সমস্যাটির সমাধানের জন্যে আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে নিয়ে এলেন, স্থানীয় লোকদের বৈদিক আচার অনুষ্ঠান পালনের রীতি পদ্ধতি শিখিয়ে দেবার জন্যে। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের রক্তের জাতিগত বিশুদ্ধতা যাতে বজায় থাকে সে উদ্দেশ্যে তিনি কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করলেন। কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ পরিবারকে বিশেষ মর্যাদা দান করে তিনি তাদের কুলীন আখ্যা দিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ করলেন। এই গোষ্ঠীর বাইরে এই পরিবারগুলির স্ত্রীপুরুষের বিবাহ তিনি নিষিদ্ধ করে দিলেন।

গোড়ার দিকে কৌলীন্য প্রথা থেকে ফল ভালই পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু পর পর কয়েক পুরুষ গত হবার পর সামাজিক ব্যাপারে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী দেবীবর ঘটক নামের এক ব্যক্তির মনে হল, এদের মধ্যে একটি নূতন নিয়মের প্রবর্তন সুবিবেচনার কাজ হবে। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন,

এদের মধ্যে কতকগুলি পরিবারে অবাঞ্ছিত রকমের অনাচার প্রশ্রয় পাচ্ছে, যাতে করে তাঁর বিবেচনায় তাঁরা নিজেদের বংশ-মর্যাদার হানি করছেন। সেই কারণে, তিনি তাঁদের আচরণের দোষগুণ বিচার করে তাঁদের কতকগুলি উপদলে বিভক্ত করে দিলেন। যাঁরা তাঁর বিচারে সর্বোৎকৃষ্ট বলে পরিগণিত হলেন, তাঁদের হল একটি উপদল, যাঁরা তাঁদের চেয়ে কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট তাঁদের আর একটি, এইভাবে আরও বিভাগ হল। বিবাহ এই উপদলগুলির মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে গেল, যেজন্যে বিবাহ বিষয়ে কতগুলি পরিবারের সঙ্গে অন্য কতকগুলি পরিবারের সাযুজ্য স্থির করে দেওয়া আবশ্যক হল। এই পংক্তি-সাম্যের নাম দেওয়া হল 'মেল বন্ধন'।

নিয়মের এই নূতন কড়াকড়ি চালু হবার ফলেই এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহু-বিবাহের প্রচলন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে লাগল।

পরিবারে কন্যাসন্তানের জন্ম হলে তাঁকে পাত্রস্থ করা ছিল একটা অপরিহার্য, অবশ্য-করণীয় ধর্মানুষ্ঠান। সুতরাং তাঁর জন্যে একটি যোগ্যপাত্র খুঁজে পেতে তাঁর পিতামাতা স্বভাবতঃই ব্যস্ত হতেন। কিন্তু যেহেতু এইসব বাঁধাবাঁধির জন্যে বিবাহযোগ্য পাত্র পাওয়া হয়ে উঠেছিল দুষ্কর, তাই উপযুক্ত শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের চাহিদা ছিল খুবই বেশী। অবস্থা ক্রমশঃ এমন দাঁড়াল যে, ধর্মাচরণরূপে বিবাহের অনুষ্ঠানটাই সব কিছুর চেয়ে বড় অপরিহার্য একটি কাজ বলে গণ্য হতে লাগল বলে পাত্রের বয়স, সে বিবাহিত কি না, এগুলি আর বিবেচনার বিষয় রইল না। যার ফলে পাঁচ বৎসর বয়সের বালকের যেমন চাহিদা হল, তেমনি হল সত্তর উত্তীর্ণ বৃদ্ধের, যাঁর হয়ত বারোটি ভার্যা বিদ্যামান।

এ যে কি বৃহৎ একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা বাহুল্যবর্জিত ভাষায় তাঁর নিম্নলিখিত বর্ণনায় বুঝিয়েছেন বর্ধমানের মহারাজা মহতাবচান্দ, যিনি এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্যে বিদ্যাসাগরের হাতে হাত মিলিয়েছিলেন।

"কুলীনরা বিবাহ করে শুদ্ধমাত্র টাকার জন্যে, বিবাহ-সংক্রান্ত কোনও কর্তব্য পালনের অভিপ্রায় তাদের থাকে না। এই সমস্ত নামে-মাত্র বিবাহিত স্ত্রীলোকেরা, বিবাহ-জনিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিশেষ করে যাদের প্রাপ্য অথচ জীবনে কোনোদিন তা উপভোগ করার কোনো আশা যাদের থাকে না,

তারা, হয় তাদের হৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত স্নেহভালবাসা নিবেদন করে দেবার মত পাত্র কাকেও পায় না বলে মর্মদাহ ভোগ করে শুকিয়ে মরে আর নয়ত তাদের সম্ভোগেচ্ছার তীব্রতা এবং শিক্ষার ক্রটি হেতু পাপের পথে পা বাড়াতে প্রলুব্ধ হয়।[১]

মনে হয় হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইনের সমর্থন লাভ করার অব্যবহিত পরেই কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার জন্যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কিন্তু এই আন্দোলনে তেমন জোর বাধল না, বোধহয় এই কারণে যে, সেই সময়ে ইতিহাস-বিশ্রুত সিপাহী বিদ্রোহ দেশকে অতর্কিতে একটা রাজনৈতিক বিপ্লবের মুখে এনে ফেলেছিল, এবং তাতে এমন একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, যার মধ্যে কোনো সামাজিক সমস্যা নিয়ে ভাববার অবসর জনসাধারণ বা সরকার কারোই ছিল না।

গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে বিদ্যাসাগর এই বিষয়টিতে মনোনিবেশ করলেন এবং আন্দোলনে প্রেরণা জোগালেন। তিনি ঠিকই ধরলেন, যে এই কদাচারকে একেবারে সমূলে বিনষ্ট করবার সব চেয়ে ভাল উপায় হল, কুলীনদের উপসম্প্রদায়গুলির মধ্যে দেবীবর কর্তৃক আরোপিত বিবাহ-সম্পর্কিত নিষেধ-বিধিগুলির অপসারণ। তিনি মত প্রকাশ করলেন, কুলীনদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্বিবাহে সমাজের অনুমোদন থাকা উচিত।

তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কর্মোদ্যম নিয়ে তিনি তাঁর কাজের প্রস্তুতি হিসাবে একের পর এক পুস্তিকা রচনা করে ব্যাপক প্রচার চালিয়ে যেতে লাগলেন। এর পর এল সরকারের কাছে তাঁর সংগৃহীত ২১,০০০ লোকের স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন পত্র, যাতে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার জন্যে আইন-প্রণয়নের প্রস্তাব করা হল। এই আবেদন-পত্রের তারিখ হল, ১৮ই মার্চ, ১৮৬৬, এবং স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন, নদীয়ার মহারাজা সতীশচন্দ্র রায়, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বিদ্যাসাগর স্বাক্ষর করেছিলেন সকলের শেষে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই আবেদনের উত্তরে সরকারের কাছ থেকে আনুকূল্য-সূচক কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

এই সময়টিতেই বিদ্যাসাগর কলেজী শিক্ষার প্রসারের কাজে অত্যন্ত

১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, অষ্টম অধ্যায়।

আগ্রহের সঙ্গে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সম্বন্ধে উডের সুপারিশ যখন সরকার কর্তৃক গৃহীত হল, তখন সরকার হিন্দু কলেজের ভার নিজেরা নিয়ে নিলেন এবং তার নূতন নামকরণ হল প্রেসিডেন্সী কলেজ। তার আগেই কলিকাতা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আজকের দিনে দেশে যে কলেজী শিক্ষার প্রচলন রয়েছে, যথারীতি তা শুরু হয়ে গিয়েছে। উচ্চতর ইংরেজী শিক্ষা অল্প-বিস্তর সরকারেরই দায়িত্ব বলে গণ্য হল। রেভারেণ্ড ডাফ তাঁর নিজের পরিচালিত স্কুলটিকে কলেজের পর্যায়ে উঠিয়ে নিলেন। এটি এখন স্কটিশচার্চেস কলেজ নামে খ্যাত।

বিদ্যাসাগর যখন ছেলেদের মধ্যে কলেজী শিক্ষা বিস্তারের কাজ নিয়ে জড়িয়ে পড়লেন, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা এই প্রকার। কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল নাম দিয়ে শঙ্কর ঘোষ লেনে একটি স্কুল খোলা হয়েছিল। পরিচালনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের ফলে এই স্কুলটি উঠে যাবার মত হয়েছিল; এঁদের একটি দল এই বিপদ্ থেকে মুক্ত হবার জন্যে বিদ্যাসাগরের সাহায্য চেয়ে তাঁকে আহ্বান জানালেন। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি ১৮৬৪ সালে স্কুলটির সেক্রেটারির কাজ গ্রহণ করলেন। তিনি স্কুলটির নাম দিলেন, হিন্দু মেট্রোপলিটান স্কুল। এর থেকে যে প্রতিক্রিয়া-পরম্পরার সূত্রপাত হল, তার পরিণতি স্বরূপ স্কুলটি কলেজে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

বিদ্যাসাগরের পরিচালনায় স্কুলটির প্রচুর শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের যোগ্যতা অর্জন করেন। এঁরা ছিলেন হিন্দু সমাজের অপেক্ষাকৃত দরিদ্রশ্রেণীর ছেলে, যে-কারণে সরকার পরিচালিত প্রেসিডেন্সী কলেজে উচ্চতর শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ ছিল তাঁদের আর্থিক সঙ্গতির নাগালের বাইরে। অবশ্য ডাফ কলেজের বেতনের হার ছিল অপেক্ষাকৃত কম এবং এঁদের আয়ত্তের মধ্যে, কিন্তু সেখানেও গোলযোগ ছিল একটু। এই কলেজটির সম্বন্ধে জনগণের মনে একটা প্রতিকূল ধারণা জন্মেছিল। তাঁরা মনে করতেন, এই কলেজটি ছাত্রদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করে থাকেন।

এই রকম একটা হব হব কিন্তু হচ্ছে না গোছের অবস্থায় বিদ্যাসাগর তাঁর স্কুলটিকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করলেন। তিনি দেখলেন, সমস্যাটির সমাধান করতে হলে হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত একটি কলেজ খুলতে হয়,

যেখানে অল্প বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের একজন প্রভাবশালী সদস্য ই. সি. বেয়লিকে লিখিত ২৭শে জানুয়ারী, ১৮৭২ সালের একটি চিঠিতে তিনি অকপটে যে মন্তব্য করেছেন, তাতেই এর সাক্ষ্য রয়েছে। চিঠির যে অনুচ্ছেদটিতে এই মন্তব্য রয়েছে সেটি এই প্রকার :

"আমি ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে এই কথাটি আপনার মনে মুদ্রিত করে দিতে চাই যে, আমাদের প্রতিষ্ঠানটিকে একটি হাই স্কুলে (কলেজে) রূপান্তরিত করার প্রয়োজন আমরা অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করছি। প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্র-বেতন বলে যা আদায় করা হয়, তা দেওয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক ছেলেদেরই সাধ্যাতীত। অন্যদিকে আবার তাদের মাতাপিতারা তাদের মিশনারি কলেজে পাঠাতেও অনিচ্ছুক বলে মেট্রিকুলেশনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তারা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি ওদের পক্ষে একটা মহৎ বর স্বরূপ হতে পারে।"

বিদ্যাসাগরের আবেদন মঞ্জুর হল, যার ফলে ১৮৭২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষার জন্যে ছেলেদের পড়িয়ে তৈরী করবার অনুমতি লাভ করল স্কুলটি। এখানকার শিক্ষণের মান এতই ভাল হল, যে তা নিয়ে চারদিকে সাড়া পড়ে গেল, কারণ সকলের এই ধারণাই ছিল যে ইউরোপীয় শিক্ষকদের সাহায্য না নিয়ে ইংরেজীতে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে কোনও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব নয়। ১৮৭৪ সালে, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তির দুবৎসর মাত্র পরে, সমস্ত সমালোচকদের সংশয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিয়ে এই স্কুলের একটি ছাত্র এফ. এ. পরীক্ষায় যোগ্যতা অনুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল। এই প্রকার একটি কৃতিত্বের পরে প্রতিষ্ঠানটিকে আরও উচ্চতর পর্য্যায়ে উন্নীত করার কাজ সহজ হয়ে গেল। বি. এ. পাঠক্রমের জন্যে অধ্যাপনার অনুমতি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় একে প্রথম শ্রেণীর কলেজের মর্যাদা দান করলেন। বিদ্যাসাগরের সুদক্ষ পরিচালনায় কলেজটির উত্তরোত্তর অধিকতর উন্নতি হতে লাগল, এবং ১৮৮৭ সালে এটি তার নিজস্ব পাকা বাড়ীতে উঠে গেল।

বিরামহীন কর্মব্যস্ততার জীবন যাপন করার ফলে ক্রমশঃ বিদ্যাসাগরের স্বাস্থ্যভঙ্গ হতে লাগল। যে বলিষ্ঠ পুরুষ একদা একটি পূর্বনির্ধারিত দিনে

তাঁর মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যে বিক্ষুব্ধ দামোদরের বন্যাস্রোতকে অগ্রাহ্য করেছিলেন, এখন দিনের পর দিন তিনি রোগজীর্ণ হয়ে পড়তে লাগলেন। জীবনের নানা ক্ষেত্রে পরার্থে অনুষ্ঠিত তাঁর বহুমূল্য সমস্ত কর্মের স্বীকৃতি একের পর এক তাঁর কাছে আসতে লাগল। ১৮৬৪ সালের জুলাই মাসে লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটী তাঁকে সম্মানিত উপাধি-মূলক সদস্য রূপে নির্বাচিত করলেন। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের নব-বর্ষ উৎসবের দিন সাম্রাজ্ঞীর দ্বারা তিনি সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত হলেন।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই, একাত্তর বৎসর বয়সে, দীর্ঘকাল ধৈর্য-সহকারে যন্ত্রণাদায়ক রোগ ভোগের পর তিনি পরলোক গমন করেন। এর তিন বৎসর পূর্বেই তাঁর পত্নীর মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর মৃতদেহ যখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তাঁর বহু সহস্র দেশবাসী শবানুগমন করে তাঁর দেহমুক্ত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। তাঁর জন্যে শোকানুষ্ঠানের যথাযোগ্য সমাপ্তি হল, ১৮৯১ সালের ২৭শে আগস্ট বাংলার ছোটলাট স্যার চার্লস এলিয়টের সভাপতিত্বে কলকাতার টাউন হলে আহূত এক শোকসভায়।

নারীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে

সমাজের এক-একজন প্রতিষ্ঠাবান্ মানুষ এক রহস্যময় সূত্র ধরে সর্বসম্মতিক্রমে এক-একটি বিশেষ আখ্যায় ভূষিত হন। 'বিদ্যাসাগর', এই সর্বজনবিদিত উপাধিটি ঈশ্বরচন্দ্র লাভ করেছিলেন তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ, একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনের কাছ থেকে। কিন্তু প্রায় সমানই প্রসিদ্ধ অপর একটি উপাধি, 'দয়ার সাগর' কখন কিভাবে যে তিনি পেয়েছিলেন তা কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়। পরের দুঃখ মোচন করবার প্রবৃত্তি থেকে অগণিত যে-সব সৎ কাজ তিনি করেছিলেন, তার থেকে অর্জিত সুনাম ছিল এর মূলে। জনগণ যেন এই উপাধিটি দিয়ে তাঁর সেই সুনামটিকে নাম-মুদ্রাঙ্কিত করে দিল।

সুতরাং নারীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার সংগ্রামে বিদ্যাসাগর যে সর্বাগ্রগণ্য যোদ্ধা রূপে অবতীর্ণ হবেন, এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। তাঁর সমবেদনা-প্রবণ হৃদয়বৃত্তি যেন এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে তাঁকে এই সংগ্রামের ক্ষেত্রে আকর্ষণ করে নিয়ে এল। তখনকার হিন্দু সমাজদেহে কুৎসিত ক্ষত অনেকগুলি ছিল, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে যেটি সবচেয়ে বড় হয়ে প্রতিভাত হল সেটি হল, সমাজে নারীদের যে স্থান তার হীনতা। আচার-আচরণের নিয়ম ছিল দু-প্রস্থ। তার একটি ছিল বিশেষ কতকগুলি সামাজিক সুযোগ-সুবিধার অধিকারী পুরুষ জাতির জন্যে, আর অন্যটি ছিল ঐ সুযোগ-সুবিধাগুলির থেকে বঞ্চিত স্ত্রীজাতির জন্যে। এই যে প্রভেদমূলক ব্যবস্থা, এর মূলে ছিল, আর্থিক ব্যাপারে স্ত্রীলোকদের পুরুষের মুখাপেক্ষিতা। তাদের এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে পুরুষরা সমস্ত রকমের সুযোগ-সুবিধাগুলি নিজেদের জন্যে সংরক্ষিত করে স্ত্রীলোকদের ন্যায্য অধিকারগুলিও তাদের দিতে চাইতেন না। এক হিসাবে সমস্ত মানব সমাজেরই এই ধারা, কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বিদ্যাসাগরের মনে এই ধারণা জন্মেছিল, যে, স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে বাঙালীদের মনোভাবের মধ্যে এই অন্যায়ের দিক্‌গুলির প্রাবল্য অনেক বেশী।

এ বিষয়ে তাঁর যা ধারণা তা তিনি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন, বহুবিবাহের বিরোধিতা করার সময় রচিত তাঁর একটি পুস্তিকাতে। তার থেকে কিছু উদ্ধৃতি নীচে দেওয়া হল :

"স্ত্রী জাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, ও সামাজিক নিয়ম দোষে পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন। এই দুর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন তাঁহারা পুরুষজাতির নিকট অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন। প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরুষ জাতি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন; তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সেই সমস্ত সহ্য করিয়া, জীবনযাত্রা সমাধান করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্ব প্রদেশেই স্ত্রীজাতির ঈদৃশী অবস্থা। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে, পুরুষ জাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃষ্যকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্য বশতঃ স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।"

সুতরাং তাঁর অনুকম্পা-প্রবণ হৃদয় স্বভাবতঃই গভীরভাবে বিচলিত হল, এবং স্বার্থপরায়ণ পুরুষদের দ্বারা তাদের উপর জোর করে চাপানো একটা অন্যায়-ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থার কবল থেকে নারীদের ন্যায্য অধিকারগুলি উদ্ধার করবার জন্যে অপরাজেয় মনোভাব নিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ছাড়া তাঁর উপায়ান্তর রইল না। কিন্তু তিনি ছিলেন যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ, তাই তাঁর নিজেরই উদ্ভাবিত একটি রণ-কৌশল অবলম্বন করে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে তাঁর অভিযান চালিয়ে যেতে লাগলেন। এই অভিযান তাঁর জীবনের সুদীর্ঘকাল ধরে চলেছিল এবং তাঁর কর্মশক্তির, এমন কি তাঁর অর্থসঙ্গতিরও অধিকাংশ তিনি এতে নিয়োগ করেছিলেন।

বস্তুতঃ নারীদের ন্যায্য অধিকারের জন্যে যুদ্ধে তিনি তিন দিক্‌ থেকে আক্রমণ চালাবেন মনস্থ করেছিলেন। যে-সব কারণে মেয়েদের উপর নানা প্রকারের বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল তার মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল, তারা যে অবস্থায় রয়েছে তার থেকে উদ্ভূত দুর্বলতা। তাই অন্যায়টার বিরুদ্ধে লড়বার সবচেয়ে ভাল পন্থা হল, সেটার মূলে আঘাত হানা। মেয়েদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের ন্যায্য অধিকারগুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সমানে সমানে পুরুষদের সঙ্গে লড়তে পারে। তাই তাঁর কর্মসূচীর মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার স্থান হল সকলের পুরোভাগে।

তারপর এল পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার পাওয়ার পথে বাধাস্বরূপ যে-সমস্ত অক্ষমতা তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সেগু'লি দূরীকরণের উপায় করা। তাই তাঁর পরের দফা কাজ হল হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের অধিকার প্রতিষ্ঠা। একই পর্যায়ের কাজ হল হিন্দু পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত বহু-বিবাহ প্রথা নিবারণ। সামাজিক ন্যায়পরতা চাইছে পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা বিলুপ্ত হোক, যাতে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই পতি-পত্নী-সম্বন্ধ সম্পর্কিত ব্যাপারে সম-অবস্থার সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে।

মনে হয়, আমাদের সমাজের উপর পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রভাব পড়ার ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই স্ত্রীশিক্ষার প্রশ্নটি হিন্দু সমাজের নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে, "কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এদেশবাসী স্ত্রীলোকদের শিক্ষার নিমিত্ত" ফিমেল সোসাইটী স্থাপন করলেন। কিন্তু হয়ত আন্দোলনটি ঠিক সময়োপযোগী হয়নি, যেজন্যে জনমতের সমর্থনের অভাবে সেটা স্থায়ী হল না।

এটা ছিল যেন ভবিতব্য যে, একজন উদারচিত্ত ইংরেজ অবশেষে স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষ নিয়ে দাঁড়াবেন। এটা ঘটল প্রায় বাইশ বৎসর পরে, এবং এই ইংরেজটির নাম হল জে. ডব্লিউ. বীটন্ (বেথুন)। ইনি ছিলেন তখনকার গভর্ণর-জেনারেলের পরিষদের ল-মেম্বার বা আইন সংক্রান্ত বিষয়ের উপদেষ্টা সদস্য। ঘটনাক্রমে ইনি ছিলেন ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এডুকেশন কমিটিরও সভাপতি। সেই সূত্রে তিনি স্বভাবতঃই স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আগ্রহান্বিত হলেন, এবং মেয়েদের জন্যে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। এর ফলে, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে, উত্তর কলকাতার হেদুয়া বা কর্ণওয়ালিস দীঘি, যার বর্তমান নাম আজাদ হিন্দ বাগ, তার পশ্চিম দিকে 'ক্যাল্কাটা ফিমেল স্কুল' নাম দিয়ে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়টির পরিচালনার জন্যে তিনি এমন একজন সেক্রেটারি চাইছিলেন যার মধ্যে পাওয়া যাবে সৃজনী প্রতিভা, দায়িত্বাধীন বিষয়টির প্রতি আন্তরিক সমর্থন এবং বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাওয়ার মত কর্মশক্তি। সঙ্গত কারণেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তাঁর মনে ধরল, কারণ তিনি ছিলেন প্রভূত পরিমাণে এই সদ্গুণগুলির অধিকারী। যে কাজে তাঁকে ডাকা হচ্ছে

সেটা তাঁর অত্যন্তই প্রিয় কাজ বলে তিনি খুশী হয়েই আমন্ত্রণটি গ্রহণ করলেন।

এই দুই ভদ্রলোকের সম্মিলিত পৃষ্ঠপোষকতায় স্কুলটির শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। বীট্‌ন্‌ এই স্কুলটির ঠিক ততটাই কল্যাণকামী ছিলেন, যতটা ছিলেন এক পুরুষ আগে ডেভিড হেয়ার, তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত ছেলেদের স্কুলটির। ইনি স্কুলটি দেখতে ঘন ঘন আসতেন, মেয়েদের মধ্যে উপহার বিতরণ করতেন, এমন কি, তাদের আনন্দ দেবার জন্যে পিঠে চড়িয়ে ঘুরে বেড়াতেন। আর এদিকে বিদ্যাসাগরের কাজ ছিল সমস্ত খুঁটিনাটির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সংস্থাটিকে গড়ে তোলা, এবং সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করা। মেয়েদেরও যে শিক্ষার সুযোগ ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে দেওয়া উচিত সে-কথাটা তাঁর স্বদেশবাসীদের মনে করিয়ে দেবার জন্যে একটি অভিনব কল্পনা তাঁর মাথায় এল। যে ঘোড়ার গাড়ীটিতে করে মেয়েদের স্কুলে আনা হত, তার গায়ে তিনি মনুসংহিতার থেকে নেওয়া এই কথা ক'টি লিখিয়ে দিলেন: "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"— কন্যাকেও একইভাবে পালন করতে হবে এবং অত্যন্ত যত্নসহকারে শিক্ষা দিতে হবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে মারাত্মক ব্যাধির কবলে পড়ে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বীট্‌নের জীবনান্ত হল। ভাবতে দুঃখ হয়, যে, যে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন সাধন তাঁর কাছে ছিল ব্রতপালনের মত, তারই আহ্বানে কাজে যাওয়ার ফলে এট ঘটিল। নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিত জনাই নামক একটি গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করবার জন্যে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এজন্যে দীর্ঘপথ তাঁকে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে যেতে হয়। পথে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে পড়ে ভিজে এসে যে জ্বর হয় তাই তাঁর মৃত্যু ডেকে আনে। তাঁর উইলে তিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির জন্যে অনেক টাকা রেখে যান, যার থেকে স্কুলটির নিজস্ব বাড়ী তৈরীর সব খরচাই প্রায় কুলিয়ে গেল। এরপর স্কুলের কর্তৃপক্ষ গভীর কৃতজ্ঞতা-বোধ থেকে তাঁর নামে স্কুলটির নামকরণ করলেন বীট্‌ন্‌ (বেথুন) স্কুল। পরবর্তীকালে মানোন্নয়নের ফলে এটি মেয়েদের জন্যে সরকার পরিচালিত একটি কলেজে পরিণত হয়।

এর আগের পরিচ্ছেদে, দক্ষিণবঙ্গের স্কুল ইনস্পেক্টরের কাজে নিযুক্ত

থাকার সময় স্ত্রীশিক্ষার সাহায্যের জন্যে বিদ্যাসাগর কতটা কি করেছিলেন তার উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নদীয়া, মেদিনীপুর, হুগলী ও বর্ধমান এই চারটি জেলায় কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, এবং সরকারী সাহায্য মঞ্জুর না হওয়া পর্য্যন্ত যাতে তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ হয় সেজন্যে নিজের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে তাদের টাকা ধার দেন। এ বিষয়টি নিয়ে বিশদভাবে কিছু বলার প্রয়োজন এখানে নেই।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রতিপোষক, কুমারী মেরী কার্পেন্টার সমস্যাটির সঙ্গে সরজমিনে ভাল করে পরিচিত হবার ইচ্ছায় ভারতবর্ষে আসেন তখন আন্দোলনটি অনেকটা জোরদার হয়। মেরী কার্পেন্টার জীবনের গোড়ার দিকে ইংলণ্ডে রামমোহন রায়ের খুব নিকট সংস্পর্শে আসেন এবং তখন থেকেই তাঁর মনে ভারতবর্ষের জন্যে যে একটি গভীর করুণার ভাব জাগ্রত হয় তাই তাঁকে এই দেশে টেনে নিয়ে আসে। মাদ্রাজ এবং বোম্বাই হয়ে বৎসরের শেষের দিকে তিনি কলকাতায় আসেন। কর্তাব্যক্তিদের মহলে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল বিপুল, এবং তিনি যখন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, বেথুন স্কুলে দুজনের সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করা হল।

এরপর আমরা দেখতে পাই, এঁরা দুজনে একসঙ্গে মেয়েদের বিভিন্ন স্কুলগুলি দেখতে যাচ্ছেন, এবং তাদের সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করছেন। এই ঘোরাঘুরির কাজের সময়েই একবার বিদ্যাসাগরকে এমন একটি গুরুতর দুর্ঘটনায় পড়তে হয়, যা তাঁর স্বাস্থ্যের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল, উত্তরপাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় দেখতে যাওয়া হবে। যে ছোট দলটি যাবেন তার মধ্যে ছিলেন মেরী কার্পেন্টার, বিদ্যাসাগর আর শিক্ষা বিভাগের দুজন শীর্ষস্থানীয় কর্মচারী, এ্যাটকিনসন এবং উড্রো। মনে হয়, বিদ্যাসাগর শেষোক্ত দুজন কর্মচারীর সঙ্গে একই ঘোড়ার গাড়ীতে করে যাচ্ছিলেন, এবং মেরী কার্পেন্টার তাঁদের পিছনে অন্য একটি গাড়ীতে ছিলেন। বালীর কাছে একজায়গায় হঠাৎ বেঁকে-যাওয়া রাস্তায় মোড় নিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর যে গাড়ীটিতে ছিলেন সেটি উল্টে যায় এবং বিদ্যাসাগর ছিটকে বাইরে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হন। দুর্ঘটনাটির বিবরণ কাগজে কাগজে ছাপা হয়ে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল, এমন কি

তখনকার দিনের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান সুরকার ধিরাজ কবিয়াল এ নিয়ে একটি গানও বেঁধেছিলেন।

কলকাতায় ও আশেপাশে মেয়েদের যে-সমস্ত স্কুল ছিল সেগুলি পরিদর্শন করার কাজ শেষ হবার পর মেরী কার্পেণ্টারের মনে হল, শিক্ষাদানের মান উন্নততর করতে হলে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। বোধ হয় বেথুন স্কুলে শিক্ষয়িত্রীদের জন্যে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার বিষয়ে একটি পরিলেখ তিনি সরকারের বিবেচনার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। বাংলার সেই সময়কার ছোটলাট স্যার উইলিয়াম গ্রে প্রস্তাবটি বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠিয়েছিলেন তাঁর মতামত জানবার জন্যে। বিদ্যাসাগরকে লেখা এই সম্পর্কিত চিঠিতে তিনি এমনও ইঙ্গিত করেছিলেন যে, বেথুন স্কুলকে একটি ট্রেনিং স্কুল বা প্রশিক্ষণ শিক্ষায়তনেই রূপান্তরিত করা যেতে পারে, কারণ সে-পক্ষে বলবার কথা এই আছে যে, স্কুলটির জন্যে সরকার যা খরচ করেন সেই অনুপাতে ফললাভে তাঁরা সক্ষম হননি।

বিদ্যাসাগর তাঁর একটি চিঠিতে এই প্রস্তাবগুলির উপর যে-সব মন্তব্য করেছিলেন সেগুলি একাধিক দিক্ দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। মন্তব্যগুলি তিনি যে কেবল স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন তা নয়, তিনি যে সমস্ত ব্যাপারের বাস্তব দিক্‌টা দেখতে পান, এবং সেহেতু নির্ভরযোগ্য পরামর্শ দেবার ক্ষমতা রাখেন, তাও এগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। তা ছাড়া এতে প্রকাশ পেয়েছে যে, বীট্‌ন্ কর্তৃক এই স্কুল প্রতিষ্ঠার আসল মর্মার্থটি যে কি তা হৃদয়ঙ্গম করবার শক্তি তাঁর ছিল। স্কুলটির প্রস্তাবিত রূপান্তরের বিরুদ্ধে তাঁর অভিমত তিনি যদি খুব জোরালো ভাষায় না ব্যক্ত করতেন, তাহলে এর চেহারা বদলে যেত এবং সেটা বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হত।

বিদ্যাসাগর তাঁর চিঠিতে যা বলেছিলেন তা মোটামুটি ভাবে এই: শিক্ষয়িত্রীদের জন্যে একটি ট্রেনিং স্কুল থাকা উচিত, মেরী কার্পেণ্টারের এই অভিমত নীতিগতভাবে ঠিক, কিন্তু বাস্তবতার দিক্ দিয়ে অকেজো। এর কারণ হল, অল্পসংখ্যক সহায়-সম্বলহীন বিধবা ভিন্ন এই প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক বয়ঃপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক পাওয়া যাবে না, যেহেতু জনমত স্ত্রীলোকদের এই উপজীবিকা অবলম্বনের বিরোধী। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "আপনাকে এই আশ্বাস দেওয়া বাহুল্য যে, স্ত্রীলোক শিক্ষার্থী স্ত্রীলোকদের

কাছ থেকে শিক্ষালাভ করবেন, এটাই যে আবশ্যক এবং বাঞ্ছনীয় তা আমি পরিপূর্ণভাবেই উপলব্ধি করি, কিন্তু সমাজ জীবন সম্বন্ধে আমার স্বদেশবাসী-দের কতগুলি ভ্রান্ত ধারণা এ বিষয়ে অনতিক্রমণীয় বাধা স্বরূপ। তা যদি না হত, আমি সকলের আগে এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করতাম, এবং সর্বান্তঃকরণে তাকে তার লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর করে দেবার কাজে সহযোগিতা করতাম।"[১]

তাঁর যুক্তিটিকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে তিনি চিঠিটির অন্য এক জায়গায় এই মন্তব্য করেছিলেন : "যে ভদ্রশ্রেণীর হিন্দুরা নিজেদের দশ-এগারো বৎসর বয়স্কা বিবাহিতা বালিকাদেরও অন্তঃপুরের বাইরে যেতে অনুমতি দেন না তাঁরা তাঁদের সম্পর্কিত প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাদের প্রচলিত অবরোধ-প্রথা অমান্য করে শিক্ষকতাবৃত্তি অবলম্বন করতে দেবেন কি না তা সহজেই অনুমেয়। কেবল অভিভাবকহীন অসহায় বিধবাদের দিয়ে এই কাজ করানো যেতে পারে, কিন্তু নীতির বিচারে শিক্ষাসংক্রান্ত কাজে তাঁরা নিয়োজিত হবার যোগ্য কি না তা যে বিবেচনার বিষয়, সে কথা ছেড়ে দিলেও, একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই যে, অন্তঃপুরের অন্তরাল ছেড়ে বেরিয়ে এসে তাঁরা প্রকাশ্যে শিক্ষকতা করতে প্রস্তুত আছেন এটা জানাজানি হলেই তাঁরা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পাত্রী হবেন, এবং তাঁদের কাজ থেকে যে শুভফল আমাদের অভিপ্রেত তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।"[২]

বেথুন স্কুলটি তুলে দেবার প্রস্তাবের তিনি বিরোধিতা করেছিলেন দুটি সুযুক্তিপূর্ণ কারণে। প্রথম যুক্তিটি ছিল, পরহিতব্রতী যে মহাপুরুষের নামে পরিচিত হবার সৌভাগ্য স্কুলটির হয়েছে, তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যেই এটিকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত। দ্বিতীয় যুক্তি ছিল, এই স্কুলটির দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার মহোপকার সাধিত হচ্ছে, কেননা আশেপাশের সমধর্মী অন্যান্য শিক্ষায়তনের জন্যে এটি একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের স্থান নিয়ে রয়েছে। চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধৃত করবার মত :

"এর সম্পূর্ণ অবলুপ্তি আমি অনুমোদন করতে পারি না। যে পরহিত-ব্রতী মহাপুরুষের নাম এই প্রতিষ্ঠানটি ধারণ করছে তিনি ভারতবর্ষে নারীদের মধ্যে জ্ঞানালোক বিতরণের কাজে যে পরিশ্রম করে গিয়েছেন তার স্মারক

১। মূল ইংরেজীর অনুবাদ।

২। মূল ইংরেজীর অনুবাদ।

হিসাবেও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার উপর এর দাবী আছে, এই কথাই আমি বলব। তার পরের কথা হল, রাজধানীর একেবারে ভিতরে একটি সুসংগঠিত নারী শিক্ষায়তন অন্তর্দেশীয় অন্য সমধর্মী শিক্ষায়তনগুলির আদর্শস্থানীয় হয়ে থাকবে, এটাও অত্যন্তই বাঞ্ছনীয়।"[১]

বিদ্যাসাগর যে কি বিচক্ষণ লোক ছিলেন তা তাঁর এই মন্তব্যগুলি থেকে বোঝা যায়। মেরী কার্পেন্টার যে প্রস্তাবগুলি করেছিলেন, বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের ফলাফল কি হবে সে বিচারের ক্ষমতা তাঁর ছিল না, তাই এগুলি গৃহীত হলে বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা যে দুর্বিপাকের সম্মুখীন হত, এই বিচক্ষণতার বলেই বিদ্যাসাগর তা রোধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বেথুন কলেজটি রক্ষা পেয়ে গেল কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বাংলা দেশের স্ত্রীশিক্ষা-সম্পর্কিত দায়িত্ব যাতে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রীরা নিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে একটি প্রশিক্ষণ বিদ্যায়তন বা ট্রেনিং স্কুল স্থাপন বিষয়ে মেরী কার্পেন্টারের পরিকল্পনাটিকে কার্যে পরিণত করতেও সরকার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে রইলেন।

এর ফলে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, মেরী কার্পেন্টারের প্রস্তাব অনুযায়ী মেয়েদের জন্যে একটি নর্মাল স্কুল খোলা হল কলকাতায়। কিন্তু বিদ্যাসাগর যা অনুমান করেছিলেন তাই হল, জনসাধারণের দিক্ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না বলে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এটিকে বন্ধ করে দিতে হল। বিদ্যাসাগর যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁর সারবত্তা এতে প্রমাণিত হয়ে গেল। পরিকল্পনাটি যে বিফল হল তার কারণ, দেশের লোক তখনো এটিকে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয় নি।

মেয়েদের উচ্চশিক্ষা বিষয়টি নিয়ে বিদ্যাসাগর যে কিরকম ভাবতেন তার একটা ভাল উদাহরণ পাওয়া যায়, এই ক্ষেত্রে প্রথম যে নারীরা পথ দেখিয়েছিলেন তাঁদের একজনের ছাত্রীজীবনের পরিণতি বিষয়ে তাঁর ঔৎসুক্যের মধ্যে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার প্রায় কুড়ি বৎসর পরে ২৭শে এপ্রিল তারিখে গৃহীত সেনেটের একটি সিদ্ধান্ত অনুসারে এর দ্বার নারী শিক্ষার্থিনীদের জন্যে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী বসু নাম্নী দুই ভগিনী এই সিদ্ধান্তের সুযোগ নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হলেন। তাঁরা ১৮৮৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

১। মূল ইংরেজীর অনুবাদ।

বি. এ. ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। পরের বৎসর চন্দ্রমুখী বসু এম. এ. ডিগ্রি লাভ করলেন, বাংলা দেশে তিনিই প্রথম মহিলা এম. এ.।

বিদ্যাসাগরের কাছে এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত একটি ঘটনা বলে আনন্দ জ্ঞাপনের একটি উপলক্ষ্য হল। এই আনন্দ তিনি জ্ঞাপন করলেন ক্যাসেলের একখণ্ড চিত্রশোভিত শেক্‌স্‌পীয়ার গ্রন্থাবলী মহিলাটিকে ব্যক্তিগত উপহার হিসাবে দিয়ে। তিনি নিজে স্বাক্ষর করে এবং স্বহস্তে যা লিখে উপহারটি দিয়েছিলেন তার বঙ্গানুবাদ এই :

শ্রীমতী কুমারী চন্দ্রমুখী বসু,
প্রথম বাঙালী মহিলা
যিনি মাস্টার অব আর্টস ডিগ্রি পেয়েছেন
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের,
তাঁর একজন আন্তরিক শুভানুধ্যায়ী
ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা সকাশাৎ।

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর গুণমুগ্ধ মহিলারা 'লেডিজ বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল কমিটী' নাম দিয়ে একটি কমিটী করে কিছু টাকা তুলে, সঙ্গত কারণেই বেথুন স্কুলকে দেন, তার থেকে একটি করে হিন্দু মেয়েকে তৃতীয় শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষা পাশ করবার পর এন্‌ট্রান্স পরীক্ষার জন্যে তৈরি হতে দুই বৎসরের একটি বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হবে এই উদ্দেশ্যে।

এই দান কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করে কর্তৃপক্ষ জানালেন, কমিটী যে উপায়ে তাঁদের মনের ভাব প্রকাশ করলেন সেটিকে তাঁরা খুবই প্রশংসার যোগ্য বলে মনে করেন, কারণ বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার সম্প্রসারণের জন্যে যে-মানুষ এত কিছু করে গেছেন তাঁর সেই সমস্ত পরহিতৈষণার কাজের মূল্যবোধের পরিচয় এতে রয়েছে।[১]

মেয়েদের দুর্দশা মোচনের জন্যে তাঁর প্রচেষ্টার মধ্যে যে কাজটি তাঁর উপর সবচেয়ে বেশী ভার চাপিয়েছিল তা হল, বিধবাদের পুনর্বিবাহের অধিকার আদায়ের জন্যে তাঁর সংগ্রাম। তাঁর যেমন স্বভাব ছিল, লক্ষ্যাভি-মুখে এগিয়ে যাবার জন্যে প্রথমে একটি সুপরিকল্পিত সুশৃঙ্খল কার্যক্রম তৈরি

১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, সপ্তম অধ্যায়।

করে নিলেন। মূলগত যে সংস্কার-সাধন তাঁর অভিপ্রেত ছিল, জনসাধারণের মন তার জন্যে তৈরি করে নিতে তিনি প্রবন্ধ লিখতে ও পুস্তিকা প্রকাশ করতে লাগলেন। তিনি গোড়াতেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, সবচেয়ে কঠোর প্রতিরোধ আসবে প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের দিক্ থেকে, এবং তাদের অস্ত্র নিয়েই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে না পারলে ন্যায় অন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে তাদের নিরস্ত্র করা যাবে না। বিধবাদের উপর তাদের বৈধব্য হেতুই কতগুলি বিধিনিষেধের আরোপ যে অন্যায় অবিচার, শুদ্ধমাত্র মানবিকতার এই আবেদনে তাদের মন গলবে না। যদি প্রমাণ করা যায় যে বিধবাদের এই অধিকারগুলি শাস্ত্রসম্মত, একমাত্র তাহলেই এই প্রাচীনপন্থীদের হয়ত খানিকটা টলানো যেতে পারে। তা করতে পারলে সেটার অতিরিক্ত সুবিধা একটা এই হবে যে, সরকার নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারবেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক বিধি-বিধান লঙ্ঘন করা হচ্ছে এই ভাব মনে না রেখেই বিধবা-বিবাহের বৈধতা স্বীকার করে স্বচ্ছন্দে আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে। সেরকম আইন বিধিবদ্ধ করবার জন্যে অতঃপর তিনি সরকারকে রাজী করবার চেষ্টা করবেন।

তিনি জানতেন, বিধবা-বিবাহের সমর্থন রয়েছে, শাস্ত্রের এইরূপ বাক্যাংশ উদ্ধার করতে পারার উপরেই সংগ্রামের সাফল্য নির্ভর করছে। সুতরাং প্রথমে এই কাজটিতেই তিনি মনোনিবেশ করলেন। সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীটি মূল পাঠ-সংবলিত গ্রন্থ-সংগ্রহে সমৃদ্ধ ছিল বলে তাঁর যে সাহায্য হল তা অপরিমেয়। চাকরি সংক্রান্ত কাজের মধ্যে যখনই তিনি একটু অবকাশ পেতেন, এই কাজে তা নিয়োগ করতেন। এমন কি অফিসের নিয়মিত কাজের সময়ের পরেও বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত পুঁথি পাঠের কাজ বহুরাত্রি পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলত। এতখানি আন্তরিক ও কঠোর পরিশ্রম কখনো নিষ্ফল হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত পরাশর সংহিতায় একটি বাক্যাংশ তাঁর চোখে পড়ল, যাতে কতকগুলি অবস্থা বিশেষে নারীদের পুনর্বিবাহ অনুমোদন করা হয়েছে, এবং তাঁর অত্যন্ত আনন্দ হল এই দেখে যে, যারা পুনর্বিবাহের অধিকারী তাদের তালিকার মধ্যে বিধবাদের নাম রয়েছে। বাক্যাংশটি বাংলা অনুবাদে এইরূপ দাঁড়ায়।

"স্বামী পাগল হয়ে গিয়েছে, বা তার মৃত্যু হয়েছে, বা সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ

করেছে, বা ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, বা জাতিচ্যুত হয়েছে, এই পাঁচরকমের যে কোন রকম আপদ্‌গ্রস্তা নারীর অন্য পতি গ্রহণ করা বিধেয়।"[১]

পুঁথির উপরি-উক্ত এই মূল পাঠ, যার মধ্যে বিধবাদের যে পুনর্বিবাহের অধিকার থাকা যুক্তিযুক্ত তাঁর এই অভিমতের সমর্থন রয়েছে, সেটি তাঁর হাতে ব্যবহারযোগ্য একটি শক্ত হাতিয়ারের মত হল। এইভাবে অস্ত্র-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে তাঁর মনে হল, তাঁর মাতা-পিতার অনুমোদন নেওয়া তাঁর কর্তব্য। প্রথমে তিনি খুব ভয়ে ভয়ে তাঁর পিতার কাছে কথাটা তুললেন, বললেন, বিধবাদের পুনর্বিবাহে আইনের সমর্থন লাভ করবার জন্যে ব্যাপক প্রচারের কাজ শুরু করবেন, এই তাঁর অভিপ্রায়। অবশ্য তার আগেই তিনি সতর্কতা হিসাবে বিধবাদের পুনর্বিবাহের সপক্ষে তাঁর মতবাদ সংবলিত একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেছিলেন, এই পুস্তিকাটিতে তিনি তাঁর মতবাদের পিছনে যে সব যুক্তি আছে সেগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং যুক্তিগুলির সমর্থনে সংস্কৃত পুঁথির প্রসঙ্গোচিত কতগুলি পাঠাংশ উদ্ধৃত করেছিলেন। জনশ্রুতি এই প্রকার যে, তাঁর পিতা তাঁকে শুরুতেই সোজা-সুজি একটি প্রশ্ন করেছিলেন। বলেছিলেন, যদি তিনি তাঁর প্রস্তাবটিকে অনু-মোদন না করেন তাহলে বিদ্যাসাগর কি করবেন? বিদ্যাসাগরও সোজাসুজি দ্ব্যর্থবর্জিত ভাষায় উত্তর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, যদি তাই হয়, তাহলে যতদিন তাঁর পিতা জীবিত থাকবেন, তিনি এই অভিযান শুরু করবেন না, কিন্তু তাঁর পিতার দেহান্ত হবার পর তিনি নিজের নির্বাচিত কর্মপন্থা অনুসরণ করবেন। অতঃপর ঠাকুরদাস বিষয়টি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের রচিত পুস্তিকাটি তাঁকে পড়ে শোনাতে বললেন এবং গভীর মনোযোগের সঙ্গে সেটি শুনে তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, যা করছ করে যাও।[২]

তাঁর করণীয় কাজগুলির মধ্যে যেটা ছিল সবচেয়ে কঠিন, সেটা সমাধা হয়ে যাবার পর তিনি তাঁর মায়ের অনুমতির জন্যে তাঁর দ্বারস্থ হলেন। বলা বাহুল্য যে প্রিয় পুত্রকে অনুমতি দিতে মায়ের কিছুমাত্র বিলম্ব হল না। তাঁর নিজেরও হৃদয় অনুকম্পা-প্রবণ ছিল বলে, কি দুঃখের জীবন যে হিন্দু

১। নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

২। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, অষ্টম অধ্যায়।

বিধবাদের যাপন করতে হয় তা তিনি খুব ভাল করেই জানতেন, আর সেই জন্যেই তাদের হয়ে তাঁর ছেলের এই যুদ্ধকে তাঁর সর্বান্তঃকরণের আশীর্বাদ জানালেন। কিন্তু তিনি ঠিক বুঝতে পারছিলেন না, তাঁর স্বামী এতে সম্মতি দেবেন কি না, তাই বিদ্যাসাগরকে বারণ করলেন তাঁর স্বামীকে এবিষয়ে কিছু বলতে। পিতার সম্মতি আগেই নেওয়া হয়ে গিয়েছে এই সংবাদ তাঁর পুত্র যখন তাঁকে দিলেন তখন তিনি যে কেবল বিস্ময়াভিভূতই হলেন তা নয়, তাঁর আনন্দও হল প্রচুর।

এইভাবে যুদ্ধযাত্রার পথ পরিষ্কার করে নিয়ে তিনি ১৮৫৫ সালে বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক তাঁর পুস্তিকাটি প্রকাশ করলেন। সফলতা লাভ হল সঙ্গে সঙ্গে। শোনা যায়, কয়েকদিনের মধ্যেই পুস্তিকাটির ১৫,০০০ কপি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। এর চেয়েও বেশী বিস্ময়ের বিষয় হল এই যে, অনেক অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে তাঁর কাজের সমর্থন আসতে লাগল। তখনকার দিনের একজন শীর্ষস্থানীয় কবি তাঁর আন্দোলনকে সমর্থন করে একটি কবিতা রচনা করে তাঁর প্রচেষ্টাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। কবিতাটির প্রাসঙ্গিক অংশটি এই :

বিধবার বিয়ে হবে এ ত বড় কল।
ভুগিতে হবে না তার অধর্মের ফল।
বিবাদি হয়েছে এতে যত সব খলে।
ঈশ্বরের লেখনীতে সবে যাবে তলে।

কিন্তু শান্তিপুরের তন্তুবায়েরা যা করলেন তা আর সবকিছুকে ম্লান করে দিল। তাঁরা উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে প্রচারের এক নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন। বিধবাদের পুনর্বিবাহের অধিকার অর্জনের জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিদ্যাসাগরকে সমর্থন জানিয়ে তাঁরা শাড়ীর পাড়ে একটি পদ্য বুনে দিতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা অত্যন্ত সরেস ধরণের শাড়ী বোনেন, এবং তাঁদের শাড়ীর আজও অবধি খুব চাহিদা আছে। পদ্যটি এইপ্রকার :

বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে,
সদরে করেছে রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে এমন দিন প্রচার হবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম।

এই ধরণের শাড়ীগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল এবং বিদ্যাসাগরের নামে তাদের নামকরণ হয়েছিল।

বলা বাহুল্য সমাজের গোঁড়া শ্রেণীর লোকেরা প্রতিকূল আন্দোলন শুরু করে দিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁদের ঘৃণা ছিল এতই প্রচণ্ড যে তাঁকে হয়ত মারধর করা হতে পারে, এমনও আশঙ্কা করা যাচ্ছিল। তাঁর পিতার নির্দেশ মান্য করে কিছুদিন তিনি একটি দেহরক্ষী রেখেছিলেন নিজের জন্যে। কিন্তু তাঁর রণ-কৌশল ছিল এতই ফলপ্রসূ, আর যে অভীষ্ট নিয়ে তিনি যুদ্ধে নেমেছিলেন তা ছিল এতই ন্যায়সঙ্গত যে অপর পক্ষের বিরুদ্ধতা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে গেল।

বনিয়াদটি এইভাবে বেঁধে নেবার পর বিধবাদের পুনর্বিবাহকে বিধিবদ্ধ করবার জন্যে আইন প্রণয়ন করতে সরকারের কাছে আবেদন করার কাজটি কেবল বাকী রইল। স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য প্রচার চালানর সূত্রে বিদ্যাসাগর সমাজের শীর্ষস্থানীয় প্রগতিবাদী সমস্ত ব্যক্তিদের সমর্থনও লাভ করলেন। এঁদের মধ্যে অন্যান্যদের সঙ্গে ছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রেমচাঁদ বড়াল, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রাজনারায়ণ বসু, মহেন্দ্র লাল সরকার এবং প্রখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

আবেদন গেল "বাংলা প্রদেশের হিন্দু অধিবাসীদের" কাছ থেকে "ভারতবর্ষের অনারেব্‌ল্‌ লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল" বা মাননীয় বিধান পরিষদের কাছে। এতে বলা হল, যে, বিধবা-বিবাহ দেশাচার-বিরুদ্ধ, কিন্তু এই দেশাচার "আপন স্বভাবেই কঠোর ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং নৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর, তদুপরি সমাজের অন্য অনেক প্রকার কুফল-দায়ক মহা অমঙ্গলের বীজ এতে নিহিত আছে।" আবেদনে এই গুরুতর বিষয়টির অবতারণা করতেও ভুল হল না যে, "এই দেশাচার শাস্ত্র-অনুমত নয়, এবং হিন্দুদের সমাজবিধির প্রকৃত ব্যাখ্যা যা হওয়া উচিত সেই বিধি-সম্মতও নয়।"

বিদ্যাসাগরের প্রত্যাশা যেমন ছিল তাই হল। শাসক-সম্প্রদায় যখন বুঝতে পারলেন যে, বিধবাদের পুনর্বিবাহ হিন্দুদের শাস্ত্রসম্মত তখন তাঁরা অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়েই আবেদনটিকে গ্রহণ করলেন। ভার পড়েছিল অনারেব্‌ল্‌ জে. পি. গ্রান্টের উপর। তিনি বিষয়টির একজন উৎসাহী

পক্ষাবলম্বী হয়ে দাঁড়ালেন, এবং বিলটি অনুমোদনের জন্যে উপস্থাপিত করবার সময় বললেন :

"এই বিলটি কোনও মানুষের মতবাদের উপর হস্তক্ষেপ করবে না; কিন্তু কোনো একদল লোকের মতবাদ যদি ভিন্নরকমের এবং বেশী মনুষ্যোচিত মতবাদে বিশ্বাসী প্রতিবেশীদের পরিবারবর্গের উপর দুঃখদুর্দশা ও দুর্নীতির বোঝা চাপিয়ে দিতে চায়, এ তাও হতে দেবে না।"

এইভাবে, ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই, এই বিলটি ১৮৫৬ সালের পঞ্চদশ আইন (Act XV of 1856) নামে আইনে পরিণত হয়ে হিন্দু-বিধবার সঙ্গে বিবাহ-সম্পর্ককে আইনের স্বীকৃতি দান করল। পরম রণকুশলী বিদ্যাসাগর আইনটি বিধিবদ্ধ হয়ে যাবার পর তাঁর পরবর্তী করণীয় কাজ হিসাবে একটি হিন্দু বিধবার বিবাহ দেওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের নিম্নতর পাঠশ্রেণীর একটি সতীর্থ ছিলেন শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। এঁর কিছুদিন আগে পত্নীবিয়োগ হয়েছিল। একটি বিধবা কন্যাকে বিবাহ করে অন্যদের জন্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে এঁকে রাজী করান হল। কন্যাটির বয়স ছিল দশ বৎসর এবং তাঁর নাম ছিল কালীমতী দেবী।

বিদ্যাসাগর স্থির করলেন, যে, এই বিবাহানুষ্ঠান খুব সমারোহ করে করবেন, যাতে এর সংবাদ প্রচার খুব বেশী করে হয়। আরও কয়েকটি কারণে এ-বিষয়ে তাঁর খুব সুবিধা হয়ে গেল। হিন্দুসমাজের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এটি ছিল এমনই একটি অভূতপূর্ব ঘটনা যে এমনিতেই বহুলোকের দৃষ্টি এর দিকে আকৃষ্ট হল। এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হল ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর, কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন লেকচারার রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উত্তর কলকাতার ১২ নং সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ীতে। বিদ্যাসাগর কন্যাটির পিতার স্থান গ্রহণ করে অতিথি-অভ্যাগতদের সংবর্দ্ধনার ভার নিয়ে রইলেন। কন্যার বিধবা মাতার জবানিতে সংস্কৃতে বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র লেখা হল, তাতে কন্যাটি যে বিধবা সে কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা হল। বিদ্যাসাগর অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করলেন এই দেখে যে, অনেক প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত এই নিমন্ত্রণ স্বীকার করে বিবাহে তাঁদের আশীর্বাদ জানাতে এলেন। ব্যাপারটিতে লোক-জানাজানি যতটা হওয়া উচিত ছিল তা হল। বর ও বরযাত্রীদের যথোচিতভাবে স্বাগত জানাবার জন্যে অগণিত লোক পথের

দুধারে ভিড় করে দাঁড়াল। তখনকার দিনের একটি প্রধান সংবাদপত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রকাশিত অনুষ্ঠানটির বর্ণনা থেকে জানা যায়, লোকের ভিড় এত বেশী হয়েছিল, যে, তা নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ ডাকবার প্রয়োজন হয়েছিল।

এর পরিণামে এর ঠিক পরেই যা ঘটল তাইতেই বিদ্যাসাগর খুশী হলেন সবচেয়ে বেশী। শ্রীশচন্দ্রের উদাহরণে অনুপ্রাণিত হলেন তাঁর নিজেরই পরিবারের একজন—তিনি আর কেউ নন, তাঁরই আপন পুত্র নারায়ণচন্দ্র। ইনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, তাঁর নিজেরই মনোনীত একটি বিধবার পাণিগ্রহণ করবেন স্থির করলেন। বিদ্যাসাগরের জ্যেষ্ঠ জামাতা গোপালচন্দ্র সমাজপতি যখন এই প্রস্তাবটি নিয়ে তাঁর কাছে গেলেন তখন তিনি স্পষ্টতঃই খুশী হয়ে সেটি অনুমোদন করলেন। কিন্তু মানুষকে সংস্কারমুক্ত করা বড় কঠিন কাজ। বিদ্যাসাগরের পরিবারের মধ্যে জোরাল প্রতিরোধ দেখা দিল; আর এই প্রতিরোধকে ভাষা দিলেন তাঁর অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

বিবাহানুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যাসাগর অপেক্ষা করলেন এবং তারপর বিষয়টি সম্বন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করে গম্ভীর ধরণের একটি চিঠি লিখলেন ভাইকে। এতে বোঝা যায় যে, পুত্রের ব্যবহারে তিনি যে কেবল খুশী হয়েছিলেন তাই নয়, তাঁর সর্বান্তঃকরণের অনুমোদনও তাতে ছিল। এই অবিস্মরণীয় চিঠির থেকে কিছু উদ্ধৃতি নীচে দেওয়া হল:

"২৭শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার নারায়ণ ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে, এই সংবাদ মাতৃদেবীকে জানাইবে।

"ইতিপূর্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এ বিষয় আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে; আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম যে বিবাহ করা স্থির করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা আমার পক্ষে কোন মতে উচিত কার্য হইত না। আমি বিধবা বিবাহের প্রবর্তক; আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা বিবাহ না করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না।

ভদ্র সমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। বিধবা বিবাহ আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর সৎকর্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।"

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের অন্তরতম মনের ভাবনা এবং ভাব অন্য কোনও রকমে এর চেয়েও স্পষ্ট ও সুন্দর করে প্রকাশ করা যেত না। এ বিষয়ে তিনি যা করেছিলেন সেটিকে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে তিনি নিজে মনে করতেন।

বাংলা দেশে, বিশেষতঃ কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে, যে বহু-বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের বিষয়টি নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে, এখানে তা নিয়ে বিশদ করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তবে সেই সংক্রান্ত একটি কৌতুকাবহ ব্যাপার বর্ণনা করা যেতে পারে।

বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার জন্যে বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত ও তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত আন্দোলন যখন কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বেগ সঞ্চয় করছিল, তখন ঢাকাতে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নামক তাঁর একজন সুযোগ্য সহযোগী জুটে গিয়ে পূর্ববঙ্গেও একই সঙ্গে এই আন্দোলন আরম্ভ করে দিলেন। ইনি এই অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন বলে তাঁর প্রবর্তিত আন্দোলনটিও বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ততদিনে সিপাহী বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে এবং সেইসঙ্গে কোম্পানীর রাজত্বেরও অবসান হয়েছে। রাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞীরূপে দেশের শাসনভার সরাসরি নিজের হাতে নিয়েছেন। ক্যাম্পবেল তখন বাংলার ছোটলাট। এই আন্দোলনটিকে তিনি সহানুভূতির চোখে দেখতেন।

বিধবা-বিবাহের জন্যে আইনের মঞ্জুরি লাভের আন্দোলনের সফলতা এইটেই বুঝিয়ে দিল যে, জনসাধারণের মনের অভিমুখীনতা প্রগতির দিকে এবং যেসব বাধা-নিষেধ দিয়ে মেয়েদের পঙ্গু করে রাখা হয়েছে সেগুলি দূরীকরণের জন্যে আন্দোলনের সহায়তা করতে তারা আগ্রহী। বাস্তবিক এই আন্দোলনটিতেও জনগণের যে উৎসাহ পরিলক্ষিত হল তা একটুও কম নয়। রামচন্দ্র চক্রবর্তী নামক ঢাকার একজন স্থানীয় কবি বিষয়টি নিয়ে

বীররসের ভান করে একটি কবিতা লিখেছিলেন। নীচে কবিতাটির কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করে দেওয়া হল।

কেম্বলকে মা মহারাণী কর রণে নিয়োজন।
(রাজা) বল্লালেরি সেনাদলে করিতে দমন।
কাজ নাই সিক সিফাইগণ, চাই না গোলা বরিষণ,
(একটু) আইন অসি খরষাণ করগো অর্পণ,
বিদ্যাসাগর সেনাপতি
(মোদের) রাসবিহারী হবে রথী
মোরা কুলীন যুবতী সেনা হব যে এখন।

শিক্ষা-সংস্কার

আগের একটি অধ্যায়ে আমরা শিক্ষা-সংস্কারক রূপে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলার সূত্রে স্কুল-ইনস্পেক্টারের কাজে এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় যে অর্থপূর্ণ ভূমিকা এই কাজে তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তা বলেছি। বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্রদের জন্যে ইংরেজী শিক্ষা সুলভ করবার সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি মেট্রোপলিটান স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এসমস্তই যখন বলা হয়েছে তখন এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে একটা পৃথক্ অধ্যায়ের কিছু কি প্রয়োজন আছে?

প্রয়োজন বাস্তবিকই আছে। ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছে তাতে বিষয়টির একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিকের উল্লেখ করা হয়নি। তাঁর সমস্ত কর্ম-প্রচেষ্টাতেই সবকিছু যাতে বেশ একটি সুনিয়ন্ত্রিত পথ ধরে এগিয়ে চলে সেই উদ্দেশ্যে একটি পূর্ব-পরিকল্পিত কর্মসূচী অনুসরণ করা ছিল বিদ্যাসাগরের রীতি। বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর বিভিন্ন কর্ম-প্রচেষ্টায় তিনি যে এই রীতিটি অবলম্বন করেছিলেন সেটা বেশ জোরের সঙ্গেই বলা যায়। তাঁর নিজের একটি পদ্ধতি ছিল সেটি অনুসরণ করে তিনি তখনকার দিনের তরুণদের এমন একটি সর্বাঙ্গিক শিক্ষা দিয়ে দিতেন যাতে তারা নিজেরা এক-একটি দীপ-শিখার মত তাদের চতুর্দিকে জ্ঞানের আলো বিকিরণ করতে পারে। শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা এবং সেগুলির সুষ্ঠু পরিচালনা ছিল এই কর্মসূচীর একটি দিক্। কিন্তু এর আরও কতকগুলি দিক্ ছিল। যেমন পাঠ্যপুস্তকের সুপরি-কল্পিত প্রকাশনা ছিল এদিক্‌কার কাজের একটি লক্ষণীয় অংশ। তাছাড়া কি কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে, ছাত্ররা ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা কি করে অর্জন করবে, এইসব প্রশ্নও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমাদের দেশের ইতিহাসের একটি সঙ্কট সময়ে তিনি কি উপায়ে এই সব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সেগুলির সমাধান করেছিলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি আমাদের দেশের ইতিহাসের একটি চিত্তাকর্ষক সময় এসেছিল। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্ঘাত অনেকগুলি নূতন শক্তির উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল, সেই শক্তিপ্রবাহের উজান-ভাটির আবর্তে পড়ে

অবস্থাটা খুব জটিল হয়ে উঠেছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে এর ফলে যে বিতর্কের সূত্রপাত হল তার একদিকে ছিল প্রতীক নিয়ে উপাসনা, খ্রীষ্টান ধর্মযাজকেরা পুতুল-পূজা আখ্যা দিয়ে যার অত্যন্ত নিন্দা করতেন, আর অপরদিকে ছিল খ্রীষ্টানদের গির্জায় প্রচারিত নিরাকার-উপাসনা-পদ্ধতি। এই বিতর্ক থেকে একটি নূতন ধর্মের জন্ম হল। এই প্রকার পরিস্থিতিতে তখনকার হিন্দু যুবসম্প্রদায়কে একটি অত্যন্ত জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পুতুল-পূজার বিধান আছে বলে তাঁরা হিন্দুধর্মকে অত্যন্ত হেয় বলে প্রচার করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন, ডি-রোজিওর অনুগামীরা যা করেছিলেন? না মিশনারিদের পীড়াপীড়িতে কান না দিয়ে চিরাচরিত প্রথায় নিজেদের ধর্মানুষ্ঠানগুলিকেই আঁকড়ে ধরে থাকবেন? না কি তৃতীয় যে একটি পথ আছে সেইটি অনুসরণ করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দ্বারা গঠিত মধ্যপথাবলম্বী নূতন ধর্মীয় ভ্রাতৃসঙ্ঘে যোগ দেবেন? এই সমস্যাসঙ্কুল অবস্থাতে কোনো একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ তাঁদের পক্ষে কঠিন হল, এবং কঠিন হয়েই রইল যতদিন না, প্রায় এক পুরুষ কাল অতীত হবার পর, রামকৃষ্ণ এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দ তাঁদের একটা সমাধানের পথের সন্ধান দিলেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও, কোন্ শিক্ষা-পদ্ধতি তাঁরা অনুসরণ করবেন তা নিয়ে তাঁদের ঠিক একই রকমের একটি পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হল। একদিকে ছিল প্রাচীন পদ্ধতির শিক্ষার আকর্ষণ, যার জন্যে বিজাতীয় শাসকরাও যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তারপর ছিল যে-ধরণের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা হিন্দুকলেজ ও বিভিন্ন মিশনারি কলেজগুলিতে দেওয়া হত, তার অধিকতর মনোজ্ঞ আকর্ষণ। একই বিজাতীয় সরকার এই পদ্ধতির শিক্ষাকে তাঁদের আনুকূল্য দান করে তার প্রচারের সুযোগ প্রসারিত করবার জন্যে মফঃস্বলের নানাস্থানে জিলা স্কুল স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা কি এই শিক্ষা-পদ্ধতিটিই গ্রহণ করবেন? শিক্ষার একটি সারাংশ হল ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা অর্জন। এই ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হবে কি তাঁদের মাতৃভাষা, বাংলা? ধরা যাক ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে বাংলাকেই তাঁরা গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁদের অভীষ্ট ফললাভ হবে কি করে? বাংলা গদ্যের অবস্থা যে অত্যন্তই অপরিণত। তাহলে কি ইংরেজীকেই মাধ্যম বলে স্বীকার করবেন? ইংরেজীর আকর্ষণ ছিল একাধিক রকমের। এর গদ্য সাহিত্য

অতি চমৎকার। শাসক-সম্প্রদায়ের ভাষা বলে এর মর্যাদা অপরিমেয়। কোন্ পথ তাঁদের অবলম্বনীয় তা স্থির করা সহজ ছিল না।

বিষয়টি নিয়ে বিদ্যাসাগর গভীর ভাবে চিন্তা করলেন, এবং শেষ পর্যন্ত এমন একটি সমাধানে পৌঁছলেন যা ছিল প্রচলিত মতের বিরোধী কিন্তু তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, যে, শিক্ষিত বাঙালীদের ভাবপ্রকাশের মাধ্যম বাংলাই হতে হবে, কিন্তু যেহেতু বাংলা এখনো যথেষ্ট পরিণত অবস্থায় আসেনি, ছাত্রদের জন্যে সংস্কৃত ভাষার একটি পাঠক্রমের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানের বনিয়াদ তৈরি হলে বাংলায় তারা আরও ভাল করে নিজেদের ভাব প্রকাশে সমর্থ হবে। কিন্তু তাদের কর্তব্য হবে সত্যিকারের বিজ্ঞান-ভিত্তিক জ্ঞান প্রচার করা। আর এজন্যে ইংরেজী ভাষাতেও পারদর্শী হওয়া তাদের পক্ষে অপরিহার্য হবে, যাতে বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় বিদ্যা অধিগত করা তাদের সম্ভব হয়। তিনি এই মত পোষণ করতেন, যে, এই পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষা দিলে, এমন একদল ছাত্র তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসবে যারা হবে জ্ঞানের সত্যিকারের বর্তিকা-বাহী অগ্রদূত। ইংরেজী শিক্ষার সাহায্যে তারা জ্ঞান আহরণ করবে, আর সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করার ফলে মাতৃভাষায় তাদের ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা বাড়বে।

এডুকেশন কমিটির তৎকালীন সেক্রেটারি ডাঃ মুয়াটের সঙ্গে তিনি যে পত্র-ব্যবহার করেছিলেন তাতে তাঁর এই পরিকল্পনাকে তিনি সুস্পষ্ট রূপ দিয়েছেন। কলকাতার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করবার পর ডঃ ব্যালান্টাইনের কতগুলি সুপারিশের ফলে যে বিতর্কে বিদ্যাসাগর জড়িত হয়ে পড়েছিলেন, এ ছিল তারই একটি অঙ্গ। এই সুপারিশের অনেকগুলিকে কাজে রূপায়িত করা কলেজের অধ্যক্ষ রূপে বিদ্যাসাগরের কঠিন মনে হচ্ছিল, তাই কর্তৃপক্ষ যখন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তা করতে তাঁকে চাপ দিচ্ছিলেন তখন তাঁর মধ্যেকার শক্তিধর মানুষটি আত্মপ্রকাশ করল। আর তাই থেকেই শুরু হল সেই তর্ক-বিতর্ক, পূর্বেকার এক অধ্যায়ে যে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমরা কেবল দেখতে চাই, শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনাটি নিয়ে তিনি নিজে কি বলেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর মতামত সম্বলিত একটি ইংরেজী চিঠি থেকে খানি কটা অনুবাদ করে দেওয়া যাক :

"বাংলায় যথোপযুক্ত ব্যুৎপত্তি যাতে তারা অর্জন করতে পারে সেজন্যে প্রথমে তাদের সংস্কৃত শিখিয়ে তারপর ইংরেজীতে তাদের সত্যিকারের জ্ঞান দান করার স্বাধীনতা যদি আমাকে দেওয়া হয়, আর আমার এই কাজে যদি আমাকে এডুকেশন কমিটি থেকে সাহায্য এবং উৎসাহ দেওয়া হয়, তাহলে আমি আপনাকে কথা দিতে পারি যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে, এমন একদল ছাত্রকে আমি তৈরি করে দেব, যারা তাদের লেখার এবং শেখাবার ক্ষমতার গুণে এমন যোগ্যতার সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজে সহায়তা করবে, যেমনটি আপনাদের ইংলণ্ডস্থ বা ভারতীয় কোনো কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্র বলে পরিগণিত কারও দ্বারা সম্ভব নয়।"[১]

শিক্ষা বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনাটির যেগুলি বৈশিষ্ট্য সেগুলি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা এর থেকে পরিষ্কার ভাবেই পাওয়া যায়। তাঁর মতে শিক্ষার্থীকে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করতে হবে, এবং এটা সে সবচেয়ে ভাল করে পারবে তার মাতৃভাষাতে। এই ক্ষমতা যথোপযুক্ত ভাবে আয়ত্ত করতে হলে সংস্কৃতে তাদের একটা গোড়াপত্তন হওয়া দরকার, কারণ এই ভাষার সাহিত্য একদিকে যেমন নিঃসন্দেহে পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে ঐশ্বর্য-সম্পন্ন, অন্যদিকে তেমনি বাংলার সঙ্গে রয়েছে তার নাড়ীর যোগ। কিন্তু জ্ঞানালোক বিতরণের সত্যিকারের সহায়ক হতে হলে শিক্ষার্থীর ইংরেজী শিক্ষালাভেরও প্রয়োজন আছে, কেননা ঐ ভাষার সাহায্যেই বিজ্ঞানচর্চার সর্বাধুনিক ফল সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা তার পক্ষে সম্ভবপর।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যাসাগর, কাজগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে, কতগুলি সুপ্রাচীন ও সর্বোৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ ও বিভিন্ন পাঠক্রমের উপযুক্ত বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার একটি কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। এই কর্মসূচীর প্রথম ধাপে এইসব গ্রন্থ প্রকাশের জন্যে প্রয়োজন হল একটি ছাপাখানার। স্থাপিত হল "সংস্কৃত প্রেস" ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথমে এতে তাঁর শরিক ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার, পরে বিদ্যাসাগর প্রেসটিকে সম্পূর্ণ নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে নিলেন। একই সময়ে এর একটি পরিপূরক সংস্থা হিসাবে সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীর জন্ম হল, প্রেস থেকে প্রকাশিত পুস্তকগুলি মজুত রেখে বিক্রয় করবার জন্যে।

১। ডাঃ মুয়াটকে লিখিত ৫. ১০. ১৮৫০ তারিখের চিঠি।

এই সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পর তিনি সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে তিন শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশের এক বিরাট্‌ পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নামলেন। এক শ্রেণীতে রইল তাঁর স্বরচিত সংস্কৃত ব্যাকরণের কয়েকখানি বই; আর এক শ্রেণীতে থাকল অত্যন্ত যত্নসহকারে সম্পাদিত সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলী; তৃতীয় শ্রেণীতে স্থান পেল, একেবারে নীচতলা থেকে শুরু করে এক-এক তলা করে উঠে সর্বোচ্চ তলায়, যেখানে ভাষার উপর শিক্ষার্থীর দখল সম্পূর্ণ হয়েছে, তাদের সবকটি তলার উপযুক্ত করে তাঁর নিজেরই রচিত বাংলা গ্রন্থপরম্পরা।

প্রশ্ন হতে পারে, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ব্যাকরণের পাঠ্যপুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হলেন কেন? এটা করবার তাঁর যথেষ্ট কারণ ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবেশের চাবিকাঠির মত হল তার ব্যাকরণটি অধিগত করা। কিন্তু এর সূত্রগুলি নানা খুঁটিনাটি নিয়ে এতই বহু-বিস্তৃত, এবং কারক, ক্রিয়ার কাল, ইত্যাদি ভেদে এর মধ্যে নানাপ্রকার রূপান্তরের সংখ্যা এতই বেশী যে, একে আয়ত্ত করা অত্যন্তই আয়াসসাধ্য এবং শ্রম-সাপেক্ষ হয়। শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ বাড়াবার জন্যেই যেন প্রচলিত ব্যাকরণের সূত্রগুলি লিখিত হত কতগুলি সঙ্কেত-ধর্মী সংক্ষিপ্ত ধ্বনি-সমবায়ে, যথাযোগ্য টীকা-টিপ্পনি ভিন্ন যেগুলি এমনিতে ছিল দুর্বোধ্য।

তখনকার দিনের অনুসৃত পদ্ধতি অনুসারে ছাত্রদের দীর্ঘ তিন বৎসর ধরে বোপদেবের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ শিখানো হত। সঙ্কেত-ধর্মী সংক্ষিপ্ত সূত্র-গুলির অর্থ বিশেষ না বুঝেই সেগুলি তাদের কণ্ঠস্থ করতে হত। শিক্ষা লাভের এই প্রণালী ছিল অত্যন্তই ক্লান্তিকর, এবং এতে ফললাভ যা হত তা ছিল, সময় এবং প্রযত্ন যতটা তার জন্যে ব্যয় হত সে তুলনায়, অকিঞ্চিৎকর। এই কষ্টকর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরকে নিজে যেতে হয়েছিল বলে, তিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন, যে, সংস্কৃত ব্যাকরণ আয়ত্ত করার সমস্যাটির সমাধানের জন্যে আরও যুক্তিসম্মত পথে অগ্রসর হওয়া উচিত।

এই কারণেই তিনি দুই স্তরের দুটি ব্যাকরণ লিখলেন। প্রথমটি হল আরম্ভ-কালীন ধরণের, শিক্ষার্থীদের মনে সংস্কৃত ব্যাকরণের মূলগত বৈশিষ্ট্যগুলির সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিয়ে দেবার জন্যে লেখা। 'উপক্রমণিকা'—এই নামটির মধ্যেই তার পরিচয় রয়েছে। উপরকার স্তরের ব্যাকরণটির অধ্যয়ন

চলবে এইটিকে ভিত্তি স্বরূপ করে, এই ছিল উদ্দেশ্য। সেই ব্যাকরণটির নাম দেওয়া হল 'ব্যাকরণ-কৌমুদী' এবং সেটি সংস্কৃত ব্যাকরণের সমগ্র ক্ষেত্রটি পরিক্রমা করে তিন ক্ষেপে প্রকাশিত হল। মূলতঃ যে ছকটি অনুসরণ করা হয়েছে এই ব্যাকরণে, সেটি এতই যুক্তিসহ এবং এর বিষয়-বিন্যাস এতই সুশৃঙ্খল, যে, ছাত্রদের পক্ষে এটিকে আয়ত্তে আনা সহজ হল। ব্যাকরণের এই বই-দুটির চিরকালীন উৎকর্ষের প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল এই যে, আজও অবধি বাংলাদেশের স্কুলগুলিতে সংস্কৃত ব্যাকরণের এই বই-দুটি সবচেয়ে বেশী সমাদৃত। এক শ বছরেরও বেশী হয়েছে এদের বয়স তবু এদের ছাড়া এখনো আমাদের চলছে না।

সংস্কৃত ব্যাকরণ শেখানো সহজ করার কাজ হাতে নেবার জন্যে বিদ্যাসাগর কিসের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন, সে-বিষয়ে কৌতুকাবহ একটি গল্প আছে। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ীতে দেখা করতে আসতেন। একদিন এইরকম দেখা করতে এসে তিনি বিদ্যাসাগরের অনুজ দীনবন্ধুকে কালিদাসের মেঘদূতের মূল পাঠ থেকে উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করতে শুনলেন। আবৃত্তির কথাগুলির ধ্বনি-মাধুর্য তাঁকে এমনই মুগ্ধ করল যে, অপরের সাহায্য ব্যতীত যাতে সংস্কৃত সাহিত্যের রসগ্রহণ করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে সংস্কৃত ভাষা শিখবার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু একেবারে শুরুতেই যে বেড়াগুলি ডিঙ্গিয়ে বোপ-দেবের ব্যাকরণে প্রবেশ করতে হয়, সেগুলির মোকাবিলা করবার মত যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করতে পারলেন না বলে, বিদ্যাসাগর তাঁকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন এবং সমস্ত রাত জেগে তাঁর সাহায্যের জন্যে বাংলায় ব্যাকরণের একটি কাঠামোর মত তৈরি করে দিলেন। শোনা যায় যে, সেই সময় নিজের স্মারকলিপি হিসাবে যে-সমস্ত ছোট ছোট মন্তব্য তিনি টুকে রেখেছিলেন সেইগুলিকে মাল-মশলা রূপে ব্যবহার করেই প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কৃত ব্যাকরণটি বাংলায় তিনি রচনা করেন।[১]

সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রাথমিক দুরূহতার বাধাগুলি অতিক্রম করতে কৃতকার্য হবার পর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি থেকে পাঠাংশ নির্বাচন করে, সহজ পাঠগুলি থেকে শুরু করে ক্রমশঃ কঠিনতর পাঠ-সম্বলিত বিভিন্ন

১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, পঞ্চম অধ্যায়।

মানের পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজ হাতে নিলেন। ১৮৫১-৫২ সালে তিন ভাগে 'ঋজুপাঠ' নাম দিয়ে এই সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের কাজ এদের দ্বারা পূর্বের তুলনায় অনেকটাই সহজ হয়ে গেল। কাজেই এই গ্রন্থগুলি যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করল তাতে বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেবের স্নেহদৃষ্টির নীচে বসে এই ঋজুপাঠ থেকেই প্রথমে সংস্কৃত সাহিত্যের রসাস্বাদন করেছিলেন। ঋজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগে বাল্মীকির মূল রামায়ণের কতগুলি শ্লোক ছিল। ভারতবর্ষের প্রথম মহাকবির রচিত এই মহাকাব্যের সঙ্গে তাঁর যে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছে এটা রবীন্দ্রনাথের এমনই একটি রোমাঞ্চকর ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল যে, তিনি সাহসে বুক বেঁধে নিজের মাকে গিয়ে নিজের অধিগত এই বিদ্যার পরিচয় দিয়ে এসেছিলেন।[১]

এরপর প্রকাশিত হতে থাকল, বিভিন্ন হস্তলিখিত পুঁথির অতি সতর্ক এবং তুলনামূলক অধ্যয়নের পর বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত প্রধান প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থের নূতন এক-একটি সংস্করণ। এদের মধ্যে কালিদাস-রচিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও বাণের কাদম্বরী ও হর্ষচরিতম্, ভবভূতির উত্তররামচরিতম্, ভারবির কিরাতার্জুনীয়ম্ এবং মাঘের শিশুপালবধম্ এইসব বহুবিখ্যাত গ্রন্থরাজিও ছিল।

বাংলাভাষার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরকে কার্যতঃ একেবারে গোড়ার থেকে শুরু করতে হয়েছিল, এবং একমাত্র নিজের উপায়-উদ্ভাবনী-শক্তির উপর নির্ভর করে তাঁকে চলতে হয়েছিল। বস্তুতঃ বাংলাতে সে-সময় বর্ণমালারও কোনো বই ছিল না। কাজেই তাঁকে একেবারে সেইখান থেকেই কাজ আরম্ভ করতে হল। এটাই যেন ছিল বিধিলিপি যে, ছোটছোট ছেলেমেয়েদেরকে লিপি-রহস্যের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেবার জন্যে তিনিই বাংলা ভাষার প্রথম বর্ণপরিচয়ের পুস্তক প্রণয়ন করবেন। ১৮৫৫ সালে তাঁর রচিত বাংলা প্রথম পাঠ 'বর্ণপরিচয়' নামে প্রকাশিত হল। এর প্রথম ভাগে দেওয়া হল বর্ণমালা এবং স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্তরূপ। দ্বিতীয় ভাগে দেওয়া হল ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনে যেসব যৌগিক বর্ণ হয় তাদের রূপ। প্রত্যেকটি পাঠের পর দেওয়া হল একটি করে অনুশীলনী। এই প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকগুলি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং পরবর্তীকালের রঙিন

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি।

চিত্রশোভিত চিত্তাকর্ষক বর্ণপরিচয়ের বহু পুস্তকের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও আজও পর্যন্ত তারা অপরাজেয়ই রয়েছে। এই বইগুলির যে আজ অবধি কতগুলি সংস্করণ হয়েছে তার সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

এরপর এল ছাত্রদের সহজপাঠ থেকে ক্রমশঃ কঠিন থেকে কঠিনতর পাঠের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে রচিত বিভিন্ন মানের উপযুক্ত কতকগুলি বই। এই পুস্তক-পরম্পরার প্রথমটির নাম 'বোধোদয়'। বর্ণ-পরিচয় সমাপ্ত হবার পরেই বিজ্ঞান-বিষয়ক কিছু কিছু জ্ঞান তরুণ মনগুলিতে সঞ্চারিত করে দেওয়া যায় কি না সে বিষয়ের একটি দুঃসাহসিক পরীক্ষা ছিল এর মধ্যে। এরপর এল ঈসপের গল্পগুলি অনুসরণ করে লেখা 'কথামালা' এবং তারপর মহাপুরুষদের জীবনী অবলম্বনে লেখা 'চরিতাবলী'। এই দুটি বইই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা হয়েছিল। প্রথম বইটিতে ছিল পশুপক্ষীদের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে ফেলে তাদের নিয়ে গল্প, যার উদ্দেশ্য ছিল, তরুণদের মনে বৈষয়িক বুদ্ধির সঞ্চার। দ্বিতীয়টিতে দেওয়া হল, তাদের অনুকরণের যোগ্য কতকগুলি জীবনাদর্শ।

ভাষার উপর ছাত্রদের চলনসই রকমের দখল জন্মাবার পর শেষ ধাপের পাঠ্য হিসাবে বিদ্যাসাগর আরও দুটি গ্রন্থ রচনা করলেন, এদের একটির নাম 'শকুন্তলা' এবং অন্যটির নাম 'সীতার বনবাস'। সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে পরিগণিত, কালিদাস এবং ভবভূতি বিরচিত দু'টি নাটকের কাহিনীর এরা গদ্যরূপ। ল্যাম্বের 'টেল্‌স্ ফ্রম শেক্‌স্‌পিয়ার'-এর আদর্শে রচিত হলেও বইদুটিতে মূলগ্রন্থের খুঁটিনাটি রক্ষিত হয়েছে অনেক বেশী। বইদুটি নিজগুণেই এখন বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির মধ্যে স্থান লাভ করেছে। এই বইদুটি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য অন্য এক প্রসঙ্গে পরে বিশদভাবে বলা হবে।

আমরা দেখেছি যে, তিনভাগে বিভক্ত কর্মসূচী নিয়ে বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনাটি রচিত হয়েছিল। বাংলাভাষায় ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা অর্জনের জন্য সংস্কৃত সাহিত্য আয়ত্ত করার ব্যবস্থা এতে ছিল, তারপর ছিল বাংলা সাহিত্য-পরিচিতি এবং তৃতীয় কর্মসূচীতে ছিল, হিন্দু কলেজ ও খ্রীষ্টীয় মিশনারিদের কলেজে যে-ধরনের ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হত সেই ধরনের ইংরেজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। বৈজ্ঞানিক বিদ্যায় সমৃদ্ধ বলে পাশ্চাত্ত্য

শিক্ষাকে বিদ্যাসাগর যে অত্যন্ত সমীহ করতেন, তাঁর নিজের ব্যবহারেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নিজে যখন ছাত্র ছিলেন, তখন সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন পাঠক্রম অধ্যয়ন করার সময় তখনকার দিনে যে ইচ্ছা-নির্ভর ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হত তার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে যতদিন না ইংরেজীতে মনোভাব প্রকাশের শক্তি বেশ ভালরকম অর্জন করতে পেরেছিলেন, ততদিন গৃহশিক্ষক রেখে সেই ভাষায় শিক্ষালাভ অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর ইংরেজীতে লেখা চিঠিপত্র, যেগুলির কোনো কোনো অংশের বাংলা অনুবাদ এই বইয়ে দেওয়া হয়েছে, তা থেকে এই ভাষায় যে তাঁর কতটা দখল জন্মেছিল তার ধারণা করা যায়।

দুর্ভাগ্যবশতঃ সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষার যে সুযোগটি দেওয়া হচ্ছিল সেটি কিছুদিন পরেই প্রত্যাহৃত হয়ে যায়, একথা পূর্বে বলা হয়েছে। এটিকে নিশ্চয়ই পশ্চাদপসরণ বলে অভিহিত করা চলে। এজন্যই আমরা দেখতে পাই, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হবার পরই বিদ্যাসাগর ঐ ব্যবস্থাটির পুনঃপ্রবর্তন করলেন। অতঃপর এই নূতন বিভাগটিকে এমন-ভাবে তিনি পুনর্গঠিত করলেন, যাতে ইংরেজী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জনের এটি সহায়ক হতে পারে এবং বিষয়টিকে ঐচ্ছিক না রেখে স্কুলের প্রত্যেকটি ছাত্রের অবশ্যপাঠ্য করে দিলেন। এইরকম করে তিনি দুটি সংস্কৃতির মিলনের পথ নির্মাণ করে দিলেন।

বাংলা গদ্যের স্রষ্টা

বাংলা সাহিত্যের একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। যদিও এ নিয়ে তর্কের অবকাশ রয়েছে, তবু ১২ থেকে ১৫ শতকের মধ্যে কোনো এক সময় যে বাংলা পদ্য-সাহিত্য উচ্চ স্তরের একটি উৎকর্ষে এসে পৌঁছেছিল তা মনে করবার মত তথ্যপ্রমাণেরও অভাব নেই। বাংলা সাহিত্যের গোড়ার দিকের ইতিহাসগুলিতে বিদ্যাপতিকে বাঙালী কবি বলে দাবি করা হত, কিন্তু এখন এটা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি কবিতা রচনা করতেন মৈথিলী ভাষাতে, অবশ্য সেই মৈথিলীর সঙ্গে বাংলা ভাষার খুবই নিকট সাদৃশ্য রয়েছে, আর সে ভাষার লিপিতে ব্যবহৃত অক্ষরগুলিও, অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে, বাংলা অক্ষরগুলিরই অনুরূপ। বিদ্যাপতিকে হিসাবে না ধরলে, একজন অসামান্য উৎকর্ষের অধিকারী প্রাচীন কবি বলে চণ্ডীদাসকে নিয়ে বাংলাভাষা গর্ব করতে পারে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চণ্ডীদাস যে কে ছিলেন এবং ঠিক কোন্ সময়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন এ নিয়ে প্রচুর পরস্পর-বিরোধী তথ্য বর্তমান। চণ্ডীদাস নামের অন্ততঃ পক্ষে দুইজন কবি ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের রচয়িতা ছিলেন বলে মনে করা হয়। তিনি নিজে এই গ্রন্থটিতে নিজেকে 'বড়ু চণ্ডীদাস' বলে উল্লেখ করেছেন। অপর চণ্ডীদাসকে মনে করা হয় 'পদাবলী'র রচয়িতা। এঁদের দুজনেরই রচনা উৎকৃষ্ট ধরণের, কিন্তু পদাবলী-রচয়িতার উৎকর্ষ স্থানে স্থানে এমন উচ্চমানে পৌঁছেছে যা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির সঙ্গেও পাল্লা দিতে পারে। এছাড়া এও আজকাল জানা কথা যে, 'গীতগোবিন্দ'-রচয়িতা জয়দেব এবং পূর্বোল্লিখিত বিদ্যাপতির সমান খ্যাতিসম্পন্ন, এবং শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক, চণ্ডীদাস নামের এক কবি ছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে একথার খুব স্পষ্ট উল্লেখ আছে, যে এঁর কবিতা শ্রীচৈতন্যকে অত্যন্ত আনন্দ দান করত। এইটুকুই পরিষ্কার ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে, বাকী সমস্তটাই রহস্যাবৃত।

সুতরাং স্বভাবতঃই যাঁরা বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁরা কোনও একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে একমত হতে পারেননি। নানাজনের নানা মত।

বিদ্বজ্জনদের কারও কারও মতে চণ্ডীদাস দুজন ছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলীর রচয়িতা ভিন্ন ব্যক্তি। একদল শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের রচয়িতাকে মনে করেন শ্রীচৈতন্যের পূর্বাকালীন, এবং অন্য চণ্ডীদাসকে মনে করেন তাঁর পরবর্তী কালের। আর একদল মনে করেন এই দুই গ্রন্থের রচয়িতা এক এবং অভিন্ন।

এই সমস্ত অনুমান-ভিত্তিক আলোচনার মধ্যে না গিয়েও আমরা স্বচ্ছন্দে এইটি ধরে নিতে পারি যে, বাংলা কবিতা ষোড়শ শতাব্দীর আগেই একটা সুপরিণত অবস্থায় পৌঁছেছিল। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বাধীনে প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের প্রভাব উচ্চমানের কবিতার প্রাচীন ঐতিহ্যটিকে অক্ষুন্ন রেখেছিল। উনিশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য ক্রমোন্নতির পথেই এগিয়ে চলেছিল, যদিও তার প্রকৃতি গিয়েছিল বদলে। অতঃপর তার মধ্যে অবক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পেল। বক্তব্যের চেয়ে বাচনভঙ্গির মূল্য হয়ে দাঁড়াল বেশী। যমক শব্দ প্রয়োগ, অনুপ্রাস, এবং এই ধরণের অন্য নানাপ্রকার কৌশল এই পরবর্তী যুগের কবিদের মনকে বেশী আকর্ষণ করত।

কিন্তু বাংলা গদ্য আসরে অবতীর্ণ হল কবিতার তুলনায় অনেক বিলম্ব করে। আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলা গদ্যের ব্যবহার স্বত্ব-সংক্রান্ত দলিল-দস্তাবেজ ও ব্যবসায়ীদের খাতাপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে, উনিশ শতক শুরু হবার আগে পর্যন্ত বাংলা গদ্যের কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

বিদেশী শাসকদের আবির্ভাবের ফলে যে নূতন পরিবেশের সৃষ্টি হল, তার মধ্যে বাংলা গদ্য বলতে যা বোঝায় তার জন্ম হল। ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং এ্যাক্ট বা নিয়ন্ত্রণ আইনটি পাশ হবার পর ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আইনানুগ ভাবে শাসনভার গ্রহণ করাতে এমন কতগুলি যোগাযোগ ঘটল যার ফলে দুদিক্ দিয়ে দুটি ভিন্ন শক্তি কাজ করতে লাগল। ব্রিটিশ শাসক শক্তির অধিকার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীস্টান মিশনারিরা ক্রমশঃ বেশী সংখ্যায় তাঁদের ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে আসতে লাগলেন। কেরী এবং তাঁর দলভুক্ত অন্যান্যরা শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনে তাঁদের সদর আস্তানা স্থাপন করলেন। ঐ একই সময়ে দেশের প্রশাসনিক কাজ চালাবার জন্যে কিছু সংখ্যক ব্রিটিশ কর্মচারীকে হাতে কলমে শিখিয়ে তৈরি করে নেওয়ার

প্রয়োজন দেখা দিল। তাই তাদের এই শিক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম'কলেজ নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল।

মিশনারি এবং সরকারী কর্মচারী, এই দু দলই তখন, যে-দেশে তাঁরা কাজ করবেন সে-দেশের ভাষাটা অন্ততঃ কাজ-চলা গোছের করে শেখার ভাবনা নিয়ে উদ্বিগ্ন। বাংলা গদ্যের যখন কোনো বইই নেই, তখন কাজে লাগানো যায় এমন করে সে-ভাষা তাঁরা শিখবেন কি উপায়ে? এই সমস্যার মীমাংসা না হলে চলছিল না তাই দু-তরফ থেকেই বাংলা গদ্যসাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা শুরু হল পরস্পর-নিরপেক্ষ ভাবে। কাজেই বাংলা গদ্য যে বাংলা দেশের উপর পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রভাবের ফলে উদ্ভূত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই প্রভাবগুলি যদি কাজ না করত, তাহলে বাংলা গদ্যের জন্ম আরও বিলম্বিত হত।

বাংলা গদ্যে প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের কৃতিত্ব শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট্ মিশনের প্রাপ্য। কেরী সাহেবের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে আকবরের সমসাময়িক দক্ষিণ বাংলার রাজা প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে একটি বই লেখেন রামরাম বসু। বইটির নাম ছিল 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্র', এবং এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে। কেরীর অনুরোধেই যে বইটি লেখা হয়েছিল তা তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে লিখিত ১৫ই জুন ১৮০১ তারিখের তাঁর একটি চিঠিতে। চিঠির যে অংশে কথাটা রয়েছে তার বাংলা হল, "আমি রাম বসুকে দিয়ে তাদের রাজাদের একটি ইতিহাস রচনা করিয়েছি। বাংলা ভাষায় এটিই সর্ব-প্রথম গদ্য পুস্তক।"

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কর্তাব্যক্তিরাও বেশী দূর পেছিয়ে রইলেন না। তাঁরা সেই কলেজেরই একজন লেকচারার, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে কয়েকটি বাংলা বই রচনার ভার দিলেন। এঁর প্রথম গ্রন্থ 'বত্রিশ সিংহাসন' "কিংবদন্তীমূলক ইতিহাসের ন্যায়-বিচারক রাজা বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান নিয়ে রচিত হয়। ঠিক পরের বৎসর, অর্থাৎ ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে এই বইটি প্রকাশিত হয়। এর ছয় বৎসর পর 'হিতোপদেশ' ও 'রাজাবলী' নামের আরও দুটি বই ইনি রচনা করেন।

বাংলা যে ধর্মীয় এবং দার্শনিক বিষয়ের আলোচনাতে যুক্তিসম্মত চিন্তা প্রকাশের মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হতে পারে তা কাজে করে দেখালেন

রামমোহন রায়। ইনি উনিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে জীবনের নানা ক্ষেত্রে নানা আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিলেন। হিন্দুদের পৌরাণিক রীতির পূজা অনুষ্ঠানে যে প্রতীকের ব্যবহার হয়, খ্রীষ্টান মিশনারিরা তাকে জড়পদার্থের উপাসনা আখ্যা দিয়ে অপপ্রচার শুরু করলে তার বিরোধিতা করতে গিয়ে রামমোহন ধর্ম-সংক্রান্ত তর্কবিতর্কের জালে নিজেকে গভীর ভাবে জড়িয়ে ফেলেন। এ জাতীয় পূজা-পদ্ধতিকে তিনি নিজে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন, কিন্তু নিজের দেশের সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ তাঁর এত গভীর ছিল যে, তার নিজস্ব ঐতিহ্য অনুসরণ করে ভগবানের নিরাকার উপাসনার একটি পদ্ধতি আবিষ্কারের কাজে তিনি প্রবৃত্ত হলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শিতা নিয়ে তিনি ধর্মীয় এবং দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কিত প্রাচীন পুঁথিপত্র তন্ন তন্ন করে তল্লাস করে দেখলেন এবং ব্রহ্মসূত্রের উপর ভিত্তি করে এমন একটি মণ্ডলীবদ্ধ উপাসনার পদ্ধতি লোক-সমক্ষে উপস্থাপিত করলেন, যার জন্যে দেবতার কোনো প্রতীক সম্মুখে নিয়ে বসবার প্রয়োজন হয় না।

তাঁর প্রবর্তিত এই আন্দোলনটির সমর্থনে একটি কৈফিয়ত দাঁড় করাবার জন্যে তিনি নিজের যুক্তিগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করে বেদান্তের উপর বাংলায় একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এইভাবে ধর্মীয় এবং দার্শনিক সমস্যা নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা সম্বলিত প্রথম বাংলা বই রামমোহন লিখে প্রকাশ করলেন ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে।

পথিকৃৎদের এই সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও, সে রকমের পরিণত ধরণের বাংলা গদ্যরীতির জন্মের তখনো বিলম্ব ছিল যাকে ভাবপ্রকাশের মাধ্যম রূপে ব্যবহার করে গল্প-উপন্যাসের মত সৃষ্টিধর্মী রচনা এবং বিজ্ঞান-দর্শন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহিত্য রচনা সম্ভব হতে পারে। ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত একটি রচনারীতির উদ্ভাবন করে এই সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধানের জন্যে বাংলা দেশকে আরও এক পুরুষকাল অপেক্ষা করতে হল। রামরাম বসু বা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মত মানুষ, যাঁরা প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং যাঁদের ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ছিল না, তাঁদের দ্বারা একাজ সম্ভব ছিল না। আবার হিন্দু কলেজের ছাপ মারা নবীনদেরও একাজ অসাধ্য ছিল, কারণ, পাশ্চাত্য চিন্তাধারার ঝলমলানিতে তাঁদের এমনই

দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছিল যে, যা-কিছু ভারতীয় তারই সম্বন্ধে তাঁদের মনে জেগেছিল ঘোরতর একটা অহেতুক বিতৃষ্ণা। সর্বপ্রযত্নে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শী হবার সাধনা করার দিকেই তাঁদের মনের-ঝোঁক ছিল বেশী।

বাংলা গদ্যকে এই নূতন বৈশিষ্ট্য যিনি দান করবেন, তিনি কেবল ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত হলেই চলবে না, সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলিতে দেশের যে প্রাচীন সাহিত্য বিধৃত হয়ে আছে তাতেও তাঁর বৈদগ্ধ্য হতে হবে সুগভীর। সংস্কৃতে তাঁর অধিকার হতে হবে সেই ভাষার সাহিত্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে তাঁর গোচরে আনবার পক্ষে পর্যাপ্ত। এবং সেই সঙ্গে ইংরেজী ভাষার উপরেও তাঁর দখল এতটা থাকতে হবে যাতে তিনি সূক্ষ্ম রসানুভূতি নিয়ে তার উৎকর্ষের কারণগুলি অনুধাবন করতে পারেন। আর এর সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, নিজের মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরক্তি। যোগ্যতার পরিচয়ে অপরিহার্য এই তিনটি গুণের একত্র সমাবেশ কচিৎ ঘটে। আর সেইজন্যেই ঠিক যেমনটি দরকার তেমন একটি লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রূপে আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত বাংলা গদ্যের সেই শুভদিনটি আসতে বিলম্ব হল।

সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ পরিচয় এবং সেইসঙ্গে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে সেই সাহিত্যের অপরিমেয় সঞ্চয়ের ভাণ্ডার থেকে মুক্ত-হস্তে ঋণ গ্রহণ করে বাংলা গদ্যকে সমৃদ্ধ করে তুলতে প্রবুদ্ধ করল। তিনি জানতেন, যেহেতু সুপ্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে সংস্কৃত একটি মহৈশ্বর্যশালী ভাষা এবং বাংলা ভাষার সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গি-সম্পর্ক রয়েছে, সেহেতু সেই ভাষার শব্দসম্ভার থেকে বাঙালী লেখকরা প্রয়োজন মত শব্দ আহরণ করতে পারেন। তাঁর সতর্কতা অবলম্বনের একমাত্র ক্ষেত্র ছিল, এইটে দেখা, যে ঐ করতে গিয়ে ভাষা হিসাবে বাংলা তার বৈশিষ্ট্য যেন না হারিয়ে ফেলে। দুটি ভাষার এমন একটি সংমিশ্রণ কাম্য ছিল যার মধ্যে বাংলা তার স্বাতন্ত্র্য-সূচক গুণগুলি বজায় রেখে সংস্কৃত থেকে অবারিত ভাবে ঋণ নিয়ে নিজের শব্দসম্ভারকে সমৃদ্ধ করে তুলবে। এবং এই কাম্যফল বিদ্যাসাগর লাভও করেছিলেন।

এ বিষয়ে তিনি যে কতখানি কৃতকার্য হয়েছিলেন তা ভাল করে

বোঝাতে হলে বাংলা গদ্যের পূর্বোক্ত পথিকৃৎদের প্রবর্তিত রচনারীতির সঙ্গে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিদ্যাসাগর কর্তৃক পরিমার্জিত গদ্যরচনা-রীতির তুলনা করে দেখাতে হয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সর্বপ্রথম রচিত বাংলা গদ্য গ্রন্থ রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্য-চরিত্র" থেকে একটি নমুনা নিয়ে শুরু করা যাক:

"যে কালে দিল্লীর তক্তে হোমাঙ্ বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বংগ ও বিহারের নবাব পরে হোমাঙ্ বাদসাহের ওকাত হইলে ব্যাজ হইল এ কারণে হোমাঙ্ ছিলেন বৃহত্ গোষ্ঠি তাহার অনেকগুলিন সন্তান তাহারদের আপনাদের মধ্যে আত্ম কলহ হইয়া বিস্তর বিস্তর ঝকড়া-লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল ইহাতে স্ুবাজাতের তহশিল তাগাদা কিছু হইয়াছিল।"

এই রচনারীতির মধ্যে যেটা তার অমার্জিত দিক্, যা ক্ষমার যোগ্য এই কারণে, যে, এটা ছিল একটা নূতন পথে প্রথম পদক্ষেপের প্রয়াসের ফল,—সেটার কথা ছেড়ে দিলেও, এর প্রকাশের ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই অপরিচিত ঠেকে। তার কারণ অবশ্য এই যে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত ফারসী এবং আরবী ছিল রাজকার্যে ব্যবহৃত ভাষা, যার ফলে বাংলা কথ্য ভাষার মধ্যে এই দুই ভাষার অনেক শব্দ এসে ঢুকে পড়েছিল।

এবার আমরা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত 'হিতোপদেশ' থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করব:

"প্রাজ্ঞ লোক অজর ও অমরের ন্যায় হইয়া বিদ্যা ও অর্থ চিন্তা করিবেক। আর সকল দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যাই অত্যুত্তম দ্রব্য ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যেহেতু বিদ্যার সর্বকালে চৌরাদি দ্বারা অহরণীয়ত্ব ও অমূল্যত্ব ও অক্ষয়ত্ব।"

রামরাম বসুর রচনা থেকে উদ্ধৃতির সঙ্গে তুলনায় এই উদ্ধৃতিটিতে এইটিই লক্ষণীয় যে এটিতে আরবী ও ফারসী থেকে আগত শব্দের ব্যবহার পরিহার করা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু তা করতে গিয়ে সংস্কৃত বাচন-ভঙ্গির ভারে এটি এমনই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে, যে বাংলাভাষার স্বকীয় স্বাদুতাটি মনে হয় যেন এতে একেবারেই অনুপস্থিত।

এরপর আমরা রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত গ্রন্থ' নামক বইটির থেকে কিছু

অংশ উদ্ধৃত করে দেখাতে চাই। বইটির ভূমিকা থেকে নেওয়া হয়েছে এই অংশটি :

"কিঞ্চিত মনোনিবেশ করিলে সকলে অনায়াসে নিশ্চয় করিবেন যে যদি রূপগুণ বিশিষ্ট কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্য বেদান্ত শাস্ত্রের বক্তব্য হইতেন তবে বেদান্ত পঞ্চাশদধিক পাঁচ শত সূত্রে কোন স্থানে সে দেবতার সূত্রে মনুষ্যের কোন প্রসিদ্ধ নামের কিম্বা রূপের বর্ণন অবশ্য হইত। কিন্তু এই সকল সূত্রে ব্রহ্মবাচক শব্দ বিনা দেবতা কিম্বা মনুষ্যের কোন প্রসিদ্ধ নামের চর্চার লেশ নাই।"

নূতন একটি পথে প্রথম পদক্ষেপের প্রয়াস হিসাবে রামমোহনের রচনা-শৈলীটিকে মোটের উপর ভালই বলতে হয়। অবশ্য এর মধ্যেও বাক্যবিন্যাস কতকটা জট পাকানো মতন, এবং এতে প্রসাদগুণেরও অভাব রয়েছে। তবে এর মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষণীয় যে এতেও প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

সতর্কদৃষ্টিসম্পন্ন পাঠকরা এটা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন, যে উপরের এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে কোনপ্রকার যতিচিহ্ন প্রায় নেই বললেই চলে। তখনকার দিনে বাংলা লিপিতে একমাত্র যে যতিচিহ্নের ব্যবহার জানা ছিল তা হল, একটি উর্ধ্বাধঃ রেখা যাকে আমরা বলে থাকি দাঁড়ি, যা ইংরেজী ফুলস্টপের মত একটি পূর্ণচ্ছেদ সূচিত করে। কিন্তু ব্যাকরণে যাকে বাক্য বলা হয় তার শব্দ-সমষ্টির মধ্যেকার অর্থবোধক সাময়িক বিরাম বোঝাবার কোন রীতির তখন প্রচলন ছিল না। ঠিকমত পাঠ এবং পঠিতবস্তুর অর্থ-গ্রহের জন্য এইসব যতিচিহ্নের ব্যবহার অপরিহার্য। এটা লক্ষ্য করবার মত যে, রামরাম বসুর রচনার যে উদাহরণ উপরে দেওয়া হল তাতে প্রচলিত বিরামচিহ্নটিও অতি সামান্যই ব্যবহৃত হয়েছে। একটি প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদের সমাপ্তি বোঝাতে কেবল দাঁড়ি চিহ্নটিকে ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে সেই অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বাক্যগুলি জড়িয়ে গেছে একে অপরের সঙ্গে। এর সঙ্গে তুলনায় অন্য উদ্ধৃতি-দুটিতে এই যতিচিহ্নটি একটু বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে।

পাঠ এবং পাঠের অর্থগ্রহণ এই উভয়ের সৌকর্য সাধনের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই প্রথমে বাক্যাংশগুলির মধ্যে বিরাম-চিহ্নের প্রয়োজনীয়তা

তীব্রভাবে অনুভব করলেন। এ দেশীয় কোনো সাহিত্যে এই জাতীয় বিরামচিহ্নের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না বলে তিনি দ্বিধামাত্র না করে ইংরেজী থেকে এই অত্যন্ত কার্যকর চিহ্নগুলি ধার করলেন। বাক্যের সমাপ্তি বুঝাবার জন্যে দাঁড়ি-চিহ্নের ব্যবহার অব্যাহত রেখে আর সর্বত্র ইংরেজীর অনুসরণে বিরাম-চিহ্ন ব্যবহারের রীতি তিনিই সর্বপ্রথম অবলম্বন করলেন তাঁর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে।[১]

তুলনামূলক বিচারের জন্যে এবার আমরা তাঁর 'সীতার বনবাস' বইটি থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করব। এর মধ্যে তাঁর পরিণত রচনারীতির পরিচয় পাওয়া যাবে :

"রজনী অবসন্ন হইল। মহর্ষি বাল্মীকি স্নান আহ্নিক সমাপিত করিয়া সীতা, কুশ, লব ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সীতাকে কঙ্কাল মাত্রে পর্যবসিত দেখিয়া রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। অতি কষ্টে তিনি উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণে সমর্থ হইলেন, এবং না জানি আজ প্রজালোকে কিরূপ আচরণ করে, এই চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া, একান্ত আকুল হৃদয়ে কাল যাপন করতে লাগিলেন।"

এই রচনারীতির উৎকর্ষ অত্যন্তই স্পষ্ট। এ রচনা মার্জিত রুচির পরিচায়ক এবং প্রাঞ্জল। বাংলার স্বকীয়তা বজায় রেখে এ রচনা সংস্কৃত থেকে মুক্তহস্তে ঋণ গ্রহণ করে ভাবপ্রকাশের ক্ষমতাকে সমৃদ্ধতর করেছে। এর-উৎকর্ষের দিক্‌গুলি এতই সহজে চোখে পড়ে যে সেগুলিকে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সংক্ষেপে ও মোটামুটিভাবে এই হল বাংলা গদ্যের জন্ম-ইতিহাস। সে-সময় থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কাল পর্যন্ত এইটিই বাংলা গদ্য রচনার প্রকৃত রীতি বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। পরবর্তী কালে আর এক পর্যায়ে, প্রমথ চৌধুরী সামান্য পরিবর্তিত একটি রীতির প্রবর্তন করেন। ক্রিয়ার যে রূপগুলিকে বাংলার 'সাধুভাষা'র রূপ বলা হয়, সেগুলির পরিবর্তে ধ্বনিতত্ত্বের কতগুলি বিশিষ্ট সঙ্গতির (স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি, ইত্যাদির) নিয়ম অনুসারে সেগুলি কথ্য ভাষায় যে সংক্ষিপ্ত রূপ ধারণ করে সেই রূপ-গুলিকে তিনি সাহিত্যের ভাষায় গ্রহণ করেন। তৎসত্ত্বেও লেখকদের মধ্যে

১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ অধ্যায়।

যাঁরা বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত পুরাতন রীতি অপরিবর্তিত রাখার পক্ষপাতী তাঁরা ক্রিয়াপদের অসংক্ষিপ্ত রূপগুলিই এখনও ব্যবহার করে থাকেন। এর ফলে দুরকম গদ্য রচনার রীতিই সহাবস্থান করে বাংলায় পাশাপাশি আজকাল চলছে। পুরাতন রীতিটিকে বলা হয় বিদ্যাসাগরীয় রীতি, আর প্রমথ চৌধুরী তাঁর রচনায় 'বীরবল' ছদ্মনামটি ব্যবহার করতেন বলে তাঁর প্রবর্তিত নূতন রীতিটিকে বলা হয় বীরবলী ঢং। এটা লক্ষ্য করবার মত যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পূর্বেকার সমস্ত রচনায় পুরাতন রীতিরই অনুসরণ করেছেন, কিন্তু অতঃপর যখন নূতন রীতিটি চালু হল তখন থেকে তিনি সেটির প্রতিই তাঁর পক্ষপাত দেখাতে লাগলেন। অন্যদিকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরীয় রীতিটিকেই ধরে রইলেন।

আমরা এই গ্রন্থে এখন এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছি যেখানে বিদ্যাসাগরের এই অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের স্বীকৃতির কথা দু'একটি বলা যেতে পারে। স্থানাভাব বশতঃ এসম্বন্ধে বাংলাদেশের দুজন সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যরথী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবিষয়ে কি বলেছেন, কেবল সেকথাই আমরা বলব।

প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকাতে বঙ্কিমচন্দ্র সংক্ষেপে উনিশ শতকের গোড়ার দিক্‌কার বাংলা গদ্য রচনারীতির সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সেই রীতির রচনা দীর্ঘায়ত সংস্কৃত শব্দের দ্বারা কিরূপে ভারাক্রান্ত হত তার উল্লেখ করেন, এবং তারপর মন্তব্য করেন :

"এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ মধুর বাংলা গদ্য লিখিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারেন নাই।"[১]

অন্য কোনো একটি উপলক্ষে তিনি নাকি বলেছিলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত ও গঠিত বাংলা ভাষাই আমাদের মূলধন। তাঁহারই উপার্জিত সম্পত্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি।"[২]

১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ অধ্যায়।

২। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ অধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী নিঃসৃত এই প্রশংসার মধ্যে রয়েছে বিদ্যাসাগরের রচনারীতির উৎকর্ষের যথার্থ মূল্যায়ন। বিদ্যাসাগর কর্তৃক নব-গঠিত এই রচনারীতি ব্যবহার করতে না পেলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখনী চালনায় যে বিরাট্ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। বিদ্যাসাগর যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তারই উপর বঙ্কিমচন্দ্র একটি মনোরম প্রাসাদ নির্মাণ করে বাংলা গদ্যসাহিত্যকে তার স্বকীয় একটি নূতন মর্যাদা দান করলেন।

রবীন্দ্রনাথের যে প্রশস্তি তা বিদ্যাসাগরের রচনাশৈলীর মধ্যেকার কমনীয়তার দিক্‌গুলিকে সুপরিস্ফুট করে প্রকাশ করেছে। তিনি লিখেছেন:

"বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে।"[১]

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চারিত্র পূজা।

মনেপ্রাণে মানবপ্রেমী

এক-একজন মানুষকে জনগণ যে একমত হয়ে তাদের মনের মত এক-একটি অভিধা দান করে সেটা অকারণে ঘটে না। এই অভিধা অর্জন করতে হয় ছোটখাট সব কাজ দিয়ে, যা এমনিতে লোকের খুব চোখে পড়ে না কিন্তু যেগুলি ক্রমশঃ পুঞ্জিত হয়ে উঠে মানুষটির সম্বন্ধে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করে জনগণের মনে, যা সেই অভিধা দান করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করে। এই হেতু এই অভিধার মধ্যে যে তাৎপর্য থাকে তা সামান্য নয়, এবং যাকে সেটা দান করা হয় তার সবচেয়ে বড় গুণটিরই পরিচয় সেটা বহন করে। গান্ধীকে সঙ্গত কারণেই মহাত্মা বলে অভিহিত করা হত, তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় দিকটির পরিচয় বহন করত এই অভিধা। তেমনই, বিদ্যাসাগরকে জনগণের অনুমোদিত 'দয়ার সাগর' এই যে দ্বিতীয় একটি আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছিল, তাতেও ছিল তাঁর চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যটি,—তাঁর অসাধারণ রকমের দরদী মনটির পরিচয়।

এই বৈশিষ্ট্য হেতুই তিনি নানারকমের জনকল্যাণকর কাজে যোগ দিতেন। যদিও শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার এবং সাহিত্যচর্চায় তাঁর সময় এবং সামর্থ্যের বেশীর ভাগ ব্যয়িত হত, তবু এইসব কাজের জন্যেও তিনি প্রচুর পরিমাণে অবকাশ সৃষ্টি করে নিতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জনহিতকর কোন্ কাজটি তাঁর লক্ষ্যবস্তু হবে তা তিনি নিজে স্থির করে নিতেন, অন্যান্য ক্ষেত্রে সাহায্যপ্রার্থী স্বয়ং তাঁর দ্বারে এসে উপস্থিত হত। এটা লক্ষ্য করবার মত যে, তিনি কি করবেন তা যখন নিজে স্থির করতেন, তখন সর্বদাই অবহেলিত ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের সন্ধানও নিজেই করে নিতেন।

চূড়ান্ত রকম প্রাচীনপন্থী গোঁড়ামির পরিবেশে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কোনোপ্রকার আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণে বিদ্যাসাগরের কিছুমাত্র উৎসাহ দেখা যেত না। বাস্তবিক এটা খুবই বিস্ময়ের বিষয় এইজন্যে যে, তিনি এমন এক যুগে জীবিত ছিলেন যখন ধর্ম জিনিষটাকে একটা মহা গুরুতর বিবেচনার বিষয় বলে মনে করা হত এবং যখন একটি বৃহৎ ধর্মীয় আন্দোলন এদেশে চলছিল। এই আন্দোলনের একটি পর্যায়ে দক্ষিণেশ্বরের ঋষি রামকৃষ্ণ পরম-

হংস একটি মহা আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন। ধর্মান্দোলনের নেতৃবর্গ সহ তখনকার দিনের বহু প্রখ্যাত ব্যক্তি তাঁর কাছে যেতেন সেখানে। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁকে দেখতে যাবার কোনো আগ্রহ কখনো অনুভব করেন নি। বরঞ্চ, বিদ্যাসাগরের খ্যাতির কথা শুনে সেই মহাপুরুষই সাগ্রহে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে বিদ্যাসাগর তাঁর স্বভাব-সুলভ বিনয়-নম্রতা এবং মধুর ব্যবহার দিয়ে তাঁকে আপ্যায়িত করেছিলেন। এ-সমস্তর থেকে এরকম মনে করা অন্যায় হবে না, যে, তাঁর কাছে জনহিতকর কর্মানুষ্ঠান ধর্মানুষ্ঠানেরই স্থান অধিকার করেছিল। মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন মানবপ্রেমী।

এর থেকে অপরিহার্য ভাবেই তাঁর ধর্মবিশ্বাসের প্রশ্নে আমাদের চলে আসতে হয়। এই প্রসঙ্গটি নিয়ে জল্পনা কল্পনা অনেক হয়েছে, তার কারণ তাঁর কোনো আচরণে তাঁর ধর্মবিশ্বাসের সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যেত না। এটা বোঝা যায়, যে, তিনি ধার্মিক শ্রেণীর মানুষ ছিলেন না, পূজার্চনা এবং অন্য ধরণের কোনো ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো অনুরাগ ছিল না। অন্যদিকে দেখতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মসমাজের ব্যাপারেও তিনি মনঃসংযোগ করছেন। কাজেই তাঁর ব্যবহার থেকে মানুষ এই রহস্য সমাধানের কোনও সূত্র খুঁজে পেত না। পক্ষান্তরে ধর্ম-সম্বন্ধীয় কোনো বিষয়ে তিনি নিজের অভিমত প্রকাশ্যে বলতেন না বলে, এবং দেশে তখন যে-সমস্ত প্রবল ধর্মীয় আন্দোলন চলছিল সেগুলি সম্বন্ধেও কোনো কৌতূহল প্রকাশ করতেন না বলে কেউ কেউ এমন সন্দেহকেও মনে স্থান দিতেন, যে, তিনি ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর সমকালীন একজন বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন বলে যে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, সেকথার উল্লেখ করা যেতে পারে। বিপিনবিহারী গুপ্তের স্মৃতিকথার মধ্যে এইটিও লিপিবদ্ধ আছে।[১] একই গ্রন্থে এই লেখক বিদ্যাসাগরের সমকালীন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমতও লিপিবদ্ধ করেছেন[২]: "প্রশ্ন করিলাম, 'বিদ্যাসাগর কি বাস্তবিক নাস্তিক

১। বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম খণ্ড, ১৫।

২। ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৫।

ছিলেন? উত্তর হইল, 'ঐ একরকমের নাস্তিক ছিলেন, যাকে বলে অজ্ঞেয়বাদী'।

অবশ্য নিরীশ্বরবাদ ও অজ্ঞাবাদ বা অজ্ঞেয়তাবাদের মধ্যে আকাশ প্রমাণ পার্থক্য রয়েছে। প্রথমোক্ত মতবাদ দৃঢ়ভাবে ভগবানের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, দ্বিতীয় মতবাদ এবিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে অক্ষমতার দরুণ তিনি আছেন তা যেমন বলতে পারে না, তেমনি তিনি নেই তাও বলে না। অজ্ঞাবাদীর যুক্তিবিচার এবিষয়ে তাঁকে স্থিরনিশ্চয় হতে দেয় না বলে, তিনি এই বিশ্বাসকেই অবলম্বন করে থাকেন, যে, যা পরমতম নিত্যবস্তু তার প্রকৃতি অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়।

এবিষয়ে সাক্ষাৎ এবং অকাট্য নজির সামান্য কিছু যা পাওয়া যায় তার মধ্যে কিন্তু এ মতবাদের কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না, যে, বিদ্যাসাগর নিরীশ্বরবাদী কিংবা অজ্ঞেয়তাবাদী ছিলেন। যে-সমস্ত নজির সাক্ষাৎভাবে এই প্রসঙ্গটির সঙ্গে সম্পর্কিত, প্রথমে সেগুলির উল্লেখ করা যাক।

তখনকার কালে চিঠিপত্রের উপরে ভগবানের নাম লেখার একটি রীতি প্রচলিত ছিল; এই রীতি বাঙালী ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা এখনও অনুসরণ করে থাকেন। বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের চিঠিপত্রে এই রীতিটি যে পালন করতেন তার প্রমাণ রয়েছে। 'হরি' নাম নিয়ে তিনি চিঠি শুরু করতেন। যদি তিনি নাস্তিক কিংবা অজ্ঞাবাদী হতেন ত এ অভ্যাস নিশ্চয় পরিত্যাগ করতেন। যে অভ্যাস তাঁর মতে অনুসরণ-যোগ্য নয়, তাকে ধরে থাকার মানুষ তিনি ছিলেন না।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন মেয়ার নামক একজন সিভিলিয়ান সংস্কৃত সাহিত্য এবং সংস্কৃত কলেজের ব্যাপারে প্রচুর আগ্রহমিশ্রিত কৌতূহল দেখাতেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে একবার এই কলেজ দেখতে এসে তিনি নানা বিষয়ে সংস্কৃত পদ্যরচনার একটি প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য কয়েকটি পুরস্কার ঘোষণা করেন। রচনার অন্যতম একটি বিষয় ছিল জ্যোতির্বিদ্যা এবং ভূগোল, সেইসঙ্গে ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য জ্যোতির্বিদ্‌দের মতামতের আলোচনা। বিদ্যাসাগর এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে পুরস্কারটি লাভ করেন। এই উপলক্ষে রচিত কবিতাটির তিনি

নাম দিয়েছিলেন, 'ভূগোল-খগোল-বর্ণনম'। তাঁর মৃত্যুর পর এটি ১৮৯২ সালে তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

কবিতাটির প্রথম স্তবকেই আলোচ্য বিষয়টির সমাধানের একটি সূত্র পাওয়া যায়। বাংলা অনুবাদে স্তবকটি এইরকম দাঁড়ায়:

"ক্রীড়াবর্তুলের মত এই বিস্ময়কর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যাঁর প্রকাশ, সেই মহা-মহিমাময় মহেশ্বরকে আমি প্রণাম করি।"[১]

পূর্বেই বলা হয়েছে, যে, প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রদের পাঠানুশীলনের জন্যে বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়' নামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। পুস্তকটি পরিকল্পিত হয়েছিল এইভাবে যে, এর থেকে ছেলেরা তাদের চারিদিকটা, যাতে আছে নানারকমের জড়বস্তু, নানা মৌলিক পদার্থ, বিভিন্নরকমের উদ্ভিদ, ইতরপ্রাণী, মানুষ, এমনকি পাটিগণিতের মূলসূত্রগুলি, তার সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা গড়ে নিতে পারবে। পরিকল্পনাটির ব্যাপকতাকে আরও সম্পূর্ণ করবার জন্যে তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধেও একটি অনুচ্ছেদ তাতে সংযুক্ত করেছিলেন সেটি এই:

"ঈশ্বর কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত, ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান, আমরা যাহা ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু; তিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা।"

বিদ্যাসাগর যে নিরীশ্বরবাদী বা অজ্ঞাবাদী ছিলেন না, সে-সম্বন্ধে একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পক্ষে এই নজিরগুলিই যথেষ্ট। যেহেতু তিনি স্পষ্টতঃই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, সেহেতু তিনি নিরীশ্বরবাদী হতে পারেন না। ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সুস্পষ্ট, এবং উপরে উদ্ধৃত তাঁর রচনার অংশগুলির মধ্যে কোথাও তিনি ঈশ্বরকে অজ্ঞেয় বলে উল্লেখ করেন নি, সুতরাং তিনি অজ্ঞাবাদীও হতে পারেন না।

ভগবান্‌কে যেভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন, তাতে এইটাই পরিষ্কারভাবে

১। যৎ ক্রীড়াভাণ্ডবৎ ভাতি ব্রহ্মাণ্ডমিদমদ্ভুতম্।
অসীমমহিমানং তং প্রণমামি মহেশ্বরম্॥

বোঝা যায়, যে, যে-ধরণের আস্তিক্যবাদে ভগবান্‌কে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা কিন্তু তার থেকে পৃথক্ তার প্রতিপালক পিতার মত করে কল্পনা করা হয়, তাঁর আস্তিক্য সে ধরণের ছিল না। তাঁর রচনার উপরি-উদ্ধৃত অংশগুলিতে এই কথাটাই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে, তাঁর কল্পিত ভগবান্ এই বিশ্বজগতের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত, অন্তর্লীন রূপে। ঈশ্বর ও সৃষ্টি অভেদ, এই যে দার্শনিক মতবাদ আমাদের দেশের মাটিতে জন্মলাভ করে উপনিষদগুলিতে বিধৃত আছে, বিদ্যাসাগরের মতও তারই অনুগামী। তাঁর মানব-প্রীতি সেই একই উৎস থেকে উৎসারিত হয়ে উঠেছিল যার থেকে সে যুগের ঋষিরা তাঁদের শিষ্যদের বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত দম, দান এবং দয়া এই তিনটি মূলগত সদ্‌গুণ শিক্ষা দেবার প্রেরণা লাভ করতেন। যে মনোভাবের দ্বারা তাঁরা অনু-প্রাণিত ছিলেন, তারও মূলে ছিল বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে সৃষ্টি এবং স্রষ্টার অভেদাত্মক সেই কল্পনা, যে-কল্পনা মানুষে মানুষে এমন একটি আত্মীয়তার বন্ধন দেখতে পায় যা সাধারণ পারিবারিক আত্মীয়তার বন্ধনের চেয়ে নিবিড়তর।[১]

বিদ্যাসাগরের মনটি অনুকম্পা-প্রবণ ছিল বলে কারও বিপদ্ দেখলে তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে না গিয়ে থাকতে পারতেন না। তাঁর আনুকূল্য কেবল যে অর্থসাহায্যের রূপ নিয়েই আসত তা নয়, আরও নানারূপে তা প্রকাশ পেত। এইজন্যেই আমরা তাঁকে কখনো দেখতে পাই সমাজসেবী রূপে সাধারণ মানুষের রোগ ও দারিদ্র্যজনিত দুর্গতি নিরাকরণে নিযুক্ত, আর কখনো বা, যেটা প্রায়ই ঘটত, দুর্গত ব্যক্তিবিশেষকে অর্থসাহায্য দানে অগ্রণী।

তাঁর এই জনহিত-ব্রত কেবল যে তাঁর অবকাশ ও উদ্বৃত্ত কর্মক্ষমতার অনেকখানিকে গ্রাস করত তা নয়, এর জন্যে তাঁর অর্থাগমের উপরেও টান পড়ত, যার পরিমাণ সে-সময়কার ভারতীয় মান অনুসারে খুব সামান্য ছিল না। অনুমান করা হয়, যে, তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলি থেকে গ্রন্থকর্তার প্রাপ্য হিসাবে তাঁর মাসিক ২০০০ থেকে ৩০০০ টাকার মত আয় হত। এই টাকার বেশীর ভাগই দান-দাক্ষিণ্যে ব্যয়িত হত। সম্পূর্ণ নিজেরই সঙ্গতির উপর নির্ভর করে তিনি যে তাঁর সহজীবীদের কত প্রকারে সাহায্য করতেন তার অল্প কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

১। তদেতদেবৈষা দৈবী বাক্ বদতি স্তনয়িত্নুর্দ দ দ ইতি।
তদেতত্ত্রয়মভ্যসেদ্ দমং দানং দয়াঞ্চেতি।

তাঁর জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় একটি বৃত্তান্ত[১] বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, একবার কোনও উপলক্ষ্যে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত বেশী স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে। তাই দেখে তিনি বিদ্যাসাগরকে বিশ্রাম ও নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে কোনো একটি স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়ে কয়েক সপ্তাহ থাকতে পরামর্শ দিলেন। বিদ্যাসাগর এই কারণ দেখিয়ে নিজের অক্ষমতা জানালেন, যে, তাহলে কয়েকটি অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে তিনি যে মাসহারা পাঠিয়ে থাকেন, তা পাঠানো হবে না। অবশ্য এরপর স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠল, যে, এই কাজটির ভার কোনো একজন বন্ধু ব্যক্তির উপর কেন ছেড়ে দিয়ে যাওয়া যায় না। এর উত্তরে খুবই বিস্মিত হয়ে তাঁকে শুনতে হল, যে ইতিপূর্বে একবার এই বিকল্প ব্যবস্থাটি অবলম্বন করা হয়েছিল, কিন্তু টাকাগুলি যাদের পাঠাবার কথা ছিল তাদের না পাঠিয়ে, কাজের ভারপ্রাপ্ত লোকটি নিজেই সেগুলি আত্মসাৎ করেছিলেন। এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর থেকে বিদ্যাসাগর এই কাজটি নিজেই করবেন স্থির করেছিলেন। এইবারেই কথা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছিল যে, বিভিন্ন ব্যক্তিকে পাঠানো এই ধরণের মাসহারার মোট পরিমাণ ছিল ৮০০ টাকারও বেশী। নানাজনকে নানা উপলক্ষে দেওয়া সাময়িক সাহায্য, বা ইস্কুল, ডিস্‌পেন্সারি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে অর্থদান, এগুলিকে এই হিসাবে ধরা হয়নি।

নানা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই জাতীয় যে অর্থসাহায্য তিনি করতেন তার পরিমাণ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা সম্ভব হয় তাঁর শেষ ইষ্টিপত্র বা উইলটি পাঠ করলে। অন্যান্যদের মধ্যে আত্মীয়জনসহ ৪৫ জনকে মাসিক বৃত্তি দেওয়ার নির্দেশ এতে ছিল, যার মোট পরিমাণ ৫৬১ টাকা; কিছুকিছু শর্তের অধীন আরও যে মাসহারা ছ'জন মানুষকে দেওয়ার নির্দেশ এতে ছিল তার পরিমাণ ১০৫ টাকা; তাছাড়া ছিল তাঁর স্বগ্রামে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত স্কুলটিকে মাসিক ১০০ টাকা এবং সেই গ্রামেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়টিকে মাসিক ৫০ টাকা সাহায্য দানের ব্যবস্থা।

দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টির ফলে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণবঙ্গ ও উড়িষ্যার কোনো কোনো অঞ্চলে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তাঁর নিজের জেলা এবং গ্রামটিও এই মারাত্মক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। তাঁর গ্রাম থেকে

১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, দশম অধ্যায়।

সাহায্যের আবেদন পাওয়া মাত্র তিনি সে আবেদনে সাড়া দিয়ে সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে ব্যাপক ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা করেন। এই সময় চরম দুর্দশাগ্রস্ত পরিবার-গুলির মধ্যে রান্না-করা খাবার বিতরণের জন্যে তিনি যে লঙ্গর-খানা খোলেন, তার কাজ চার মাসেরও বেশীদিন ধরে অব্যাহতভাবে চলেছিল। অনুমান করা হয় যে, এই লঙ্গরখানা থেকে বিনামূল্যে বিতরিত রন্ধনকরা খাদ্য বেশ কয়েকশত লোককে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছিল।[১]

এই ত্রাণকার্যে বিদ্যাসাগরের সহায়তা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং বর্ধমান বিভাগের সেই সময়কার কমিশনার সি. টি. মন্ট্রেসরের স্বাক্ষর-সম্বলিত একটি চিঠিতে তাঁদের সপ্রশংস স্বীকৃতি ব্যক্ত হয়েছিল এইভাবে :

"বংলাদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারির ২০ তারিখের (২০ মার্চ, ১৮৬৭) আদেশের নির্দেশ অনুযায়ী হুগলী জেলার সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষজনিত বিপন্নদের ত্রাণকার্যে আপনার বদান্যতা-পূর্ণ সাহায্যের আন্তরিকতা-পূর্ণ স্বীকৃতি আপনাকে জানাচ্ছি।"

এরকম মনে করবার কারণ রয়েছে, যে, মানুষের রোগযন্ত্রণা উপশমের জন্যে তাঁর গভীর আগ্রহই তাঁকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করেছিল। এই মতানুযায়ী চিকিৎসা-পদ্ধতির কতকগুলি বিশেষ গুণ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, যেগুলি তাঁর মনকে খুবই বেশী প্রভাবিত করেছিল। প্রথমতঃ, সুনিয়ন্ত্রিত অধ্যয়নসূচী অনুসরণ না করেও এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, এই চিকিৎসা স্বল্প-ব্যয়সাপেক্ষ বলে নিজেকে খুব বেশী আর্থিক দায়িত্বে জড়িত না করেও সমাজসেবার কাজে একে ব্যবহার করা যায়। তৃতীয়তঃ, এর ওষুধগুলি স্বল্পমাত্রায় ব্যবহৃত হয় বলে এর নাস্তিবাচক এই গুণটি আছে, যে, এর থেকে উপকার কিছু না হোক, অপকার হবার সম্ভাবনা কিছু নেই।

এইসব বিবেচনা করে অপেক্ষাকৃত দরিদ্রশ্রেণীর লোকদের মধ্যে ব্যাধির প্রকোপের বিরুদ্ধে লড়বার পক্ষে সুবিধাজনক একটি অস্ত্র হিসাবে এর ব্যবহার সম্ভব বুঝতে পেরে তিনি এই চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্বন্ধে কাজচলা গোছের জ্ঞান অর্জনের জন্যে এদিক্‌কার একজন পথিকৃৎ রাজেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে এবিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর আমরা দেখতে পাই, তিনি বিশেষ করে দীন-

১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, একাদশ অধ্যায়।

দরিদ্রদের মধ্যে, এমন কি নিজের আত্মীয়-বন্ধু এবং পরিবারস্থ লোকদের মধ্যেও মহা উৎসাহ সহকারে এই চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে যখনই তিনি কোনো কাজের সম্মুখীন হতেন, কি সুশৃঙ্খলভাবে যে তা সম্পাদন করতেন তার পরিচয় মেলে, তাঁর পরিত্যক্ত কাগজপত্রের মধ্যে আবিষ্কৃত তাঁর একটি রেজিস্ট্রিতে।[১] সুন্দর করে বাঁধানো এই বইটিতে তিনি তাঁর দ্বারা হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত রোগীদের রোগ-বিবরণ লিখে রাখতেন। ইংরেজীতে তাঁর স্বহস্তে লিখিত এই বিবরণগুলিতে থাকত, রোগীর নাম, তার রোগের লক্ষণগুলির বর্ণনা, নির্ণীত রোগ এবং কি ওষুধ দেওয়া হল তার নাম। চিকিৎসায় কি ফল হল তাও পরে যথাসময়ে এতে লিখে রাখা হত। এটা জেনে ভাল লাগে, যে, বহুমুখী-প্রতিভাসম্পন্ন শ্বশুর কর্তৃক চিকিৎসিত তাঁর পুত্রবধূ ভবসুন্দরী দেবীর নামও রোগী হিসাবে এই রেজিস্ট্রিতে লেখা আছে।

বিদ্যাসাগরের বদান্যতার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, অর্থ-সাহায্যের জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবেদনে তিনি যেভাবে সাড়া দিয়েছিলেন তার মধ্যে। মধুসূদন দত্ত ছিলেন বেশ সম্পন্ন পরিবারেরই মানুষ। প্রথম জীবনে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালাভের পর তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইংরেজী ভাষার উপর তাঁর দখল ছিল অসাধারণ, এবং তিনি প্রথমে ইংরেজীতেই কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। আমরা জানি, পরবর্তী জীবনে তিনি বাংলা রচনায় হাত দেন এবং সেই শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি বলে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু স্বভাবে অমিতব্যয়িতা অত্যন্ত বেশী ছিল বলে এই প্রতিভাধর ব্যক্তি মাঝে মাঝে সঙ্কটজনক দুরবস্থার মধ্যে পড়তেন। একবার এইরকম দুরবস্থায় পড়ে তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠান।

ব্যারিস্টারি পাশ করবার জন্যে মাইকেল তখন বিলেত গিয়েছেন। বৎসর-দুয়েক পরে Versailles-এ অবস্থানকালে বেহিসাবী খরচের অভ্যাসের দরুণ তিনি অর্থসঙ্কটের মধ্যে পড়েন। দেউলিয়া সাব্যস্ত হওয়াতে স্থানীয় শাসন-কর্তৃপক্ষ তাঁকে কারাদণ্ড দেবার ভয় দেখান। সর্বসাধারণের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হবার মত এই অবস্থা থেকে তাঁকে পরিত্রাণ করবার জন্যে তিনি

১। এই বইটি রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

এই সময় বিদ্যাসাগরের সাহায্য প্রার্থী হন। যোগ্যতর আর কারও কথা ভাবা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, কেননা বিদ্যাসাগরের করুণাপ্রবণ মন যে এ প্রার্থনায় নিশ্চয় সাড়া দেবে তাতে সন্দেহমাত্র ছিল না। অবিলম্বে বেশ কিছু টাকার প্রয়োজন জানিয়ে মাইকেল লিখেছিলেন : "আমি ফরাসী দেশে কারাবাস করতে চলেছি, ওদিকে যদিও ভারতবর্ষে ৪০০০ টাকার মত আমার পাওনা আছে, আমার ভাগ্যহীনা স্ত্রীকে সন্তানদের নিয়ে আশ্রয়ের জন্যে কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হতে হবে।

"এই যে বেদনাদায়ক অবস্থার সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে, আপনিই একমাত্র সুহৃদ্ যিনি এর থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারেন। আপনার হৃদয়বত্তার মধ্যেকার পৌরুষ এবং আপনার প্রতিভার নিত্যসহচর আপনার যে অসাধারণ কর্মোদ্যম, তাই নিয়ে এই কাজটিও আপনাকে সমাধা করতে হবে। এতে একটি দিনও বিলম্ব হলে চলবে না।"

বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই মর্মস্পর্শী চিঠিটির উত্তর অবিলম্বে এল, যদিও বিদ্যাসাগরের হাতে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় কাজটি কঠিন হয়েছিল। সহজেই বোঝা যায় যে, তাঁর কোনো অর্থসঞ্চয় ছিল না। কিন্তু তাঁর স্বভাবসুলভ উদ্যম সহকারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সব করে তিনি ঋণ নিয়ে ১৫০০ টাকা সংগ্রহ করলেন এবং Versailles-এ পাঠিয়ে দিলেন।

টাকাটা মধুসূদনের হাতে এমন সময় পৌঁছল যার চেয়ে বেশী সঙ্কটজনক সময় আর হতে পারে না। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে আগস্ট মধুসূদন টাকাটা যখন পেলেন, তখন তাঁর অর্থের সম্বল সামান্য তিন ফ্রাঁতে এসে ঠেকেছে। বিদ্যাসাগরের বদান্যতার দানের প্রাপ্তি স্বীকার করে মাইকেল যে চিঠি লেখেন তাতে এসমস্তেরই বর্ণনা ছিল। এই চিঠিতেই বিদ্যাসাগরকে তিনি যে শ্রদ্ধার্ঘ্য দান করেন, তা অমর হয়ে রয়েছে এই কারণে যে এর কথাগুলি একজন বিপন্ন মানুষের হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে বলে তাদের মধ্যে কৃত্রিমতা কিছু নেই। তিনি লিখেছিলেন :

"আমি বললাম[১], 'আজ ত ডাক আসছে, আজ নিশ্চয় আমি খবর পাব, কারণ আমি আমার আবেদন এমন একজন মানুষের কাছে পাঠিয়েছি যাঁর

১। কথোপকথন হচ্ছিল তাঁর পত্নীর সঙ্গে। বিদ্যাসাগরকে লেখা মাইকেল মধুসূদন দত্তের ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪ তারিখের লেখা চিঠি দ্রষ্টব্য।

প্রতিভা এবং বৈদগ্ধ্য প্রাচীনকালের ঋষিদের মত, কর্মোদ্যম ইংরেজের মত, এবং হৃদয়বত্তা বাঙালী জননীর মত।' আমি যথার্থই বলেছিলাম। এক ঘণ্টা পরেই আমি আপনার চিঠি এবং আপনার পাঠানো ১৫০০ টাকা পেলাম। হে আমার উদার-হৃদয় বহুখ্যাতিমান্ মহা সুহৃদ্, আমি কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ দেব? আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন।"

মাইকেলকে সিভিল জেল থেকে রক্ষা করবার জন্য অতঃপর বিদ্যাসাগরকে আরও টাকা পাঠাতে হয়েছিল। আমরা দেখতে পাই, ঐ বৎসরেরই ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের একটি চিঠিতে মাইকেল আরও ২৪৯০ ফ্রাঁর প্রাপ্তি স্বীকার করছেন।

শেষ পর্যন্ত মাইকেল ব্যারিস্টার হয়েই দেশে ফিরে এলেন, কিন্তু নিজের বিষয়-আশয়ের দেখাশোনা কোনোদিনই তিনি সুষ্ঠুভাবে করতে পারতেন না। কাজেই বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে ধার করে নেওয়া টাকা তিনি যে পরিশোধ করতে পারেননি, এতে আশ্চর্য্যান্বিত হবার কিছু নেই। টাকাটা যেহেতু বিদ্যাসাগরকেও ধার করেই সংগ্রহ করতে হয়েছিল, নিজের পুঁজিপাটা ভেঙেই সেই ধার শোধের দায়িত্ব তাঁকে নিতে হয়। একজন বিপন্ন বন্ধুকে হৃদয়বান্ একজন মানুষ নিজের অর্থসম্বল থেকে টাকা ধার দিচ্ছেন, এটা সহজেই কল্পনা করা যায়। কিন্তু একজন বন্ধু অসুবিধায় পড়েছেন বলে তাঁকে সাহায্য করার জন্যে কেউ প্রভূত পরিমাণ টাকা ধার করছেন, এমনটি সচরাচর ঘটে না। বিদ্যাসাগর যা করেছিলেন তা যে মাইকেল কর্তৃক এমন আবেগপূর্ণ ভাষায় অভিনন্দিত হয়েছিল তাতেও বিস্মিত হবার কারণ কিছু নেই।

কলকাতা থেকে ১৫০ মাইলের মত দূরে, হাওড়া থেকে পাটনা যাবার প্রধান রেলপথটির ধারে, আদিবাসী সাঁওতালদের দ্বারা অধ্যুষিত একটি অঞ্চলে কার্মাটার নামক স্থানে বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের জন্যে একটি বাগান-বাড়ী নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই সাঁওতালরা ছিল অত্যন্তই সরল প্রকৃতির লোক, এবং এরা, যে জমির অনুর্বরতা প্রায় প্রবাদতুল্য, তাতে বহুশ্রমে কিছু ফসল ফলিয়ে কোনোরকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে দিনাতিপাত করত। এই স্থানটির শুষ্ক স্বাস্থ্যকর হাওয়া বিদ্যাসাগরের খুব পছন্দ হল। কলকাতার কষ্টকর এবং ক্লান্তিজনক জীবন থেকে মাঝে মাঝে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে তিনি

স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার এবং ক্লান্ত অবসন্ন স্নায়ুগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে নেওয়ার জন্যে এখানে এসে কয়েকটা করে দিন কাটিয়ে যেতেন।

তাঁর এই পল্লীনিবাসটির অবস্থান এই সরল প্রকৃতির মানুষগুলির খুব নিকট সংস্পর্শে আসার যে সুবিধা তাঁকে দান করল, তাতে অবহেলিত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সেবাকার্যের নূতন একটি সুযোগও তিনি লাভ করলেন। তিনি এদের সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে অবাধ মেলামেশা করতেন, টাকা ও আহার্য বস্তু দিয়ে তাদের সাহায্য করতেন এবং রোগাক্রান্ত হলে তাদের চিকিৎসা করতেন। স্বভাবতঃই অতি অল্পদিনের মধ্যে তিনি তাদের একজন প্রিয় বন্ধু স্থানীয় হয়ে উঠলেন। তাঁর সৌহার্দ্যকে তারা অত্যন্তই মূল্যবান্ জিনিষ বলে মনে করত এবং তাঁর সেবার মর্ম তারা খুব আন্তরিক ভাবেই উপলব্ধি করত।

বাংলার আর-একজন কৃতী সন্তান হরপ্রসাদ শাস্ত্রী[১] যে একটি বিশদ বিবরণ লিখে রেখে গিয়েছেন তার থেকে সাঁওতালদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের জীবন যাপনের একটি সুন্দর চিত্র আমরা পাই। লক্ষ্ণৌএর ক্যানিং কলেজে হরপ্রসাদকে একটি অস্থায়ী লেক্‌চারারের কাজ নিতে বলা হয়। লক্ষ্ণৌ যাবার সময় মাঝপথে কার্মাটারে নেমে তিনি একটি দিন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর বাংলো বাড়ীতে কাটিয়ে যান। স্থান-সংক্ষেপের জন্যে তাঁর সেখানে অবস্থান-কালীন অভিজ্ঞতার একটি সারাংশ মাত্র নীচে দেওয়া হল। এই অসাধারণ মানুষটির সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বিবরণ হিসাবে এটি মূল্যবান্।

কার্মাটারে পৌঁছবার পর বাড়ীটিকে ঘুরে ফিরে দেখার সময় একটি কক্ষের অসাধারণ রকমের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে হরপ্রসাদ চমৎকৃত হন। তিনি দেখতে পান, এই ঘরটির চতুর্দিকেই দেয়াল-জোড়া তাক কিন্তু এই তাকগুলির সব-কটিই শূন্য। তিনি প্রথমে এর কারণ কিছুই বুঝতে পারেন নি, কিন্তু একটু পরেই কারণটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হল। একটু বেলা হতেই সাঁওতালরা দলে দলে তাদের ক্ষেতের ফসল ভুট্টা বিদ্যাসাগরকে বেচতে আসতে লাগল। তারা দাম যা চাইল তাই দিয়েই বিদ্যাসাগর সেই ভুট্টা ক্রয় করে সেই কক্ষটির শূন্য তাকগুলিতে সাজিয়ে রাখলেন। এবারে বোঝা গেল যে, ঐ কক্ষটির

১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গ্রন্থাবলী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, দ্বিতীয় খণ্ড ১ম পৃষ্ঠা।

সারি সারি এই তাকগুলি সাঁওতালদের ক্ষেতের ফসল জমা করে রাখবার জন্যেই তৈরি হয়েছে। কিন্তু আর-একটা প্রশ্নের উত্তর কিন্তু তখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এই সমস্ত মজুত রাখা ভুট্টার বিরাট্ ভাণ্ডার নিয়ে বিদ্যাসাগর কি করবেন? স্পষ্টতঃই তিনি এগুলিকে নিজে খেয়ে ত শেষ করতে পারবেন না?

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্থির করলেন, অপেক্ষা করে থেকে দেখবেন কি ঘটে। যথাসময়ে তাঁর এই ধৈর্য ধরে থাকার পুরস্কার তিনি পেলেন। বেলা যখন দুপুরের কাছাকাছি, তখন আর একদল সাঁওতাল বাড়ীতে আসতে আরম্ভ করল। এদের চেহারা দেখে মনে হল, এরা প্রথম দলটির সাঁওতালদের চেয়েও দরিদ্র। এরা সঙ্গে করে কোনো ফসল নিয়ে আসেনি, এসেছে খালি হাতে এবং এসেই খাবার চাইছে। বিদ্যাসাগর তখন তাঁর সকালের দিকে কেনা ভুট্টার ভাণ্ডার থেকে ভুট্টা বের করে এনে এদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। সাঁওতালরা গাছের শুকনো পাতা ও খড়কুটো সংগ্রহ করে এনে আগুন ধরাল এবং ঐ ভুট্টা সেঁকে নিয়ে খেয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি করল। এরপর চলে গেল তারা। দুটি ঘটনাকে একসঙ্গে জুড়ে হরপ্রসাদ দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর পেয়ে গেলেন।

এর কিছুক্ষণ পরে এক সময় শাস্ত্রী মহাশয় বাড়ীর কর্তাকে বাড়ীতে কোথাও দেখতে পেলেন না। বোঝা গেল, কেউ না জানতে পারে এমন-ভাবে বিদ্যাসাগর বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় যখন সামনের শূন্য মাঠগুলির দিকে তাকিয়ে তিনি কোথায় গেলেন ভাবছেন, তখন দেখা গেল, বিভিন্ন চাষীর ক্ষেতের আল বেয়ে তিনি বাড়ী ফিরে আসছেন। তিনি হাতে করে ছোট একটি বাক্স নিয়ে আসছেন দেখা গেল। বাড়ী ফিরে এসে বিদ্যাসাগর তাঁর অনুপস্থিতির জন্যে ক্ষমাভিক্ষা করলেন এবং জানালেন, একটি সাঁওতাল ছেলের নাক দিয়ে অত্যন্ত বেশী রক্ত পড়ছিল বলে তার মা তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিল, তাই তাড়াতাড়ি গিয়ে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় তাঁকে সেই রক্তপড়া বন্ধ করে আসতে হয়েছে। শাস্ত্রী মহাশয় জিজ্ঞাসা করে জানলেন, বিদ্যাসাগরের বাগানবাড়ী থেকে সেই সাঁওতাল নারীর কুটীরের দূরত্ব দেড় মাইলের মত। এটা ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা হচ্ছে, যখন বিদ্যাসাগরের বয়স ৫৮ বৎসর।

মূল্যায়ন

আমরা এ যাবৎ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের কার্যাবলীর মধ্যে তাঁর যে ছবিটি পাওয়া যায়, তাই আঁকতে চেষ্টা করেছি। এতে বাইরে থেকে মানুষটাকে দেখে কিরকম মনে হত সেই ধারণাই বড়জোর আমাদের জন্মায়, এবং সেই কারণেই সেটাকে যথেষ্ট সন্তোষজনক বলা চলে না। যদি বিদ্যাসাগরের মনের মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব হত, যাতে করে তাঁর বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ যে কর্মপ্রেরণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত তার উৎস-মূলগুলির সঙ্গে অমোদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটত, তাহলে ভিতরের মানুষটার একটা সত্যকারের ছবি আমরা পেতে পারতাম, "যন্ত্রটির হৃৎস্পন্দন"[১] আমাদের কাছে ধরা পড়ত।

সে সুবিধা যখন আমাদের নেই, তখন তার পরেকার সবচেয়ে ভাল উপায় যা আছে তা হল, যে সমস্ত গুণগ্রাম দিয়ে তাঁর চরিত্র গঠিত হয়েছিল, সেগুলির সহায়তায় তাঁর মূল্যায়ন করা। কিন্তু এ কাজটিও সহজসাধ্য নয় কেননা বিদ্যাসাগর সাধারণ মানুষ ছিলেন না। অগণিত গুণের জটিল সমাবেশ নিয়ে তিনি একক মাহাত্ম্যে জীবনের পথে চলে গিয়েছেন বলিষ্ঠ দীর্ঘ পদক্ষেপে, তিনি যে একজন আছেন এটা জীবনের নানা ক্ষেত্রে অনুভব করেছে সকলে, এবং উচ্চাবচ সকলে উচ্ছ্বসিত ভাষায় শ্রদ্ধার অর্ঘ্য তাঁকে নিবেদন করেছে। তাঁর চরিত্রের জটিলতাই এই কাজটিকে কঠিন করেছে এবং আমরা একটু পরেই দেখতে পাব যে, তাঁর একটি সর্বাত্মক চরিত্র-চিত্রণের কাজে একাধিক প্রখ্যাত ব্যক্তি অসমর্থ হয়েছেন।

তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের এই মূল্যায়নগুলিকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হওয়া যাক। আমাদের কাজের সুবিধার জন্যে এমন একজনের শ্রদ্ধার্ঘ্য বিশ্লেষণ করে আমরা শুরু করব, যিনি তাঁর বন্ধুস্থানীয় ছিলেন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা-বোধের যাঁর ব্যক্তিগত কারণ বিদ্যমান ছিল। কিরকম অবস্থার মধ্যে পড়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিদ্যাসাগরের, "প্রতিভা ও বৈদগ্ধ্য প্রাচীন ঋষিদের মত, কর্মোদ্যম ইংরেজের মত এবং হৃদয়বত্তা বাঙালী জননীর মত"

১। "The very pulse of the machine",—ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থের ভাষায়।

বলে বর্ণনা করে তাঁর অবিস্মরণীয় চিঠিটি লিখেছিলেন, সেকথার উল্লেখ ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের চারটি বড় উপাদানের উল্লেখ আছে এই চিঠিতে। যথা, তিনি একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ছিলেন জ্ঞানবান্, অত্যন্ত কর্মিষ্ঠ স্বভাবের ছিলেন তিনি এবং তাঁর হৃদয়টি ছিল কারুণ্যে ভরা। তাঁর এই চরিত্র-বিশ্লেষণ যে কত যথার্থ তার পরিচয় রয়েছে, এই গ্রন্থের পূর্বেকার পরিচ্ছেদগুলিতে বর্ণিত তাঁর কার্যাবলীতে। এগুলির সঙ্গে আরও কিছু কিছু এমন তথ্যের সংযোগ করা যেতে পারে যার থেকে তাঁর চরিত্রের এইদিক্গুলিই আরও স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে।

তাঁর ধীশক্তি যে ছিল অসাধারণ তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর বিচ্ছুরিত-জ্যোতি ছাত্রজীবনের মধ্যে, যেজন্যে সংস্কৃত কলেজের কর্তৃপক্ষের তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দান করার কথা মনে হয়েছিল। এবিষয়ে বেশী বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ইংরেজীতে একটা কথা আছে, ভোরবেলাতেই বোঝা যায় দিনের চেহারাটা কেমন হবে, তাই তাঁর জীবনের শুরুর দিক্কার একটি ঘটনার বর্ণনা আমরা দেব, যার থেকে বোঝা যাবে, সেই নিতান্ত বালক বয়সেই, যখন তিনি কেবল তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন, তখনই ভবিষ্যতের কি উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিজের মধ্যে তিনি বহন করতেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে, যখন তাঁর সবে আট বৎসর বয়স পূর্ণ হয়েছে, তখন তারই মধ্যে তিনি তাঁর গ্রামের স্কুলে যতটা শিক্ষালাভ করা সম্ভব ছিল তার সমস্তই শিখে নিয়েছেন। তাই তাঁর পিতা উচ্চতর শিক্ষার জন্য তাঁকে কলকাতা নিয়ে যাবেন স্থির করলেন। তাঁদের গ্রামের বাড়ী থেকে কলকাতা যাবার পথে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পিতার সঙ্গী হলেন। এই পথ অতিক্রম করতে হত পায়ে হেঁটে এবং পূর্বদিকে প্রসারিত এই পথের ধারে ধারে অনেকটা জুড়েই ছিল কলকাতার দূরত্ব নির্দেশক ইংরেজী সংখ্যাচিহ্ন সংবলিত মাইলস্টোন বা মাইলের মাপ বোঝানো পাথরের খুঁটি। প্রথম যে মাইলস্টোনটির কাছে তাঁরা এলেন সেটি বালকের সজাগ দৃষ্টি এড়াল না। এর মর্ম বুঝতে না পেয়ে বালক ঈশ্বরচন্দ্র এটিকে মসলা-বাটার শিল বলে ধরে নিলেন এবং পিতাকে প্রশ্ন করলেন, কেন এটিকে এভাবে রাস্তার ধারে পুঁতে রাখা হয়েছে।

জিনিষটি আসলে যে কি এবং কি তার মানে পিতা তাঁকে তা বললেন। কথাটা শোনা মাত্র তাঁর মনে বিচিত্র এক সাড়া জাগল। বাংলা সংখ্যাচিহ্ন-

গুলির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, তাই তাঁর মাথায় এল যে, কলকাতার পথে যেতে যেতে তিনি এই মাইলস্টোনগুলির সাহায্যে ইংরেজী সংখ্যাচিহ্ন আয়ত্ত করে ফেলবেন। এই ইচ্ছা মনে নিয়ে তিনি পিতাকে আবার প্রশ্ন করে জেনে নিলেন যে সেই বিশেষ মাইলস্টোনটিতে যে সংখ্যাটি চিহ্নিত আছে সেটি ১৯।

এরপর কোন্‌টি কি সংখ্যা তা জানবার জন্যে পিতাকে বারবার প্রশ্ন করে বিরক্ত না করে, তিনি নিজেই বুদ্ধি খাটিয়ে ইংরেজী ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা-চিহ্নগুলির কোন্‌টির যে কিরকম চেহারা তা অনুমানের সাহায্যে সহজেই বুঝে নিলেন। দশম মাইলস্টোনটির কাছে তাঁরা যখন এলেন ইংরেজী সংখ্যা চিহ্নগুলির সব-কটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়ে গিয়েছে এবং সেকথা পিতাকে তিনি জানিয়ে দিলেন। প্রথমে বিশ্বাস করতে না পেরে পিতা তাঁকে পরীক্ষা করলেন এবং দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন যে তাঁর পুত্র বাস্তবিকই চিহ্নগুলি ভাল করে শিখে নিয়েছে।[১]

বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করবার জন্যে হিন্দু নারীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার যে প্রস্তাব মেরী কার্পেণ্টার করেছিলেন, সেটা সুপরামর্শ কি না সে বিষয়ে বিদ্যাসাগর যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, তাঁর বিজ্ঞতার একটি প্রতীক উদাহরণ হিসাবে আমরা তার উল্লেখ করতে পারি। এই বিষয়টি নিয়ে পূর্বেকার একটি অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে, সুতরাং এখানে তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখই আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে যথেষ্ট হবে। মেরী কার্পেণ্টার ঠিক সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে মেয়েদের স্কুলে যাঁরা শিক্ষা দেবেন তাঁরা হবেন নারী। বিদ্যাসাগরেরও প্রস্তাবটিকে যুক্তি-যুক্তই মনে হয়েছিল কিন্তু তিনি আপত্তি জানালেন এই কারণ দেখিয়ে যে, হিন্দুসমাজ তাদের নারীদের শিক্ষণবৃত্তি পেশা হিসাবে শিক্ষা দেবার জন্যে তখনো প্রস্তুত হয়নি, এবং তারা এবিষয়ে চেষ্টার বিরোধিতা করবে। সরকার তাঁর এই অভিমতে কর্ণপাত না করে তাঁর বিপরীত পরামর্শ সত্ত্বেও শিক্ষয়িত্রীদের জন্যে একটি প্রশিক্ষণ স্কুল খোলেন। বিদ্যাসাগরের পরামর্শের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হতে তিন বৎসর মাত্র লেগেছিল, কারণ, প্রশিক্ষণ-লাভেচ্ছুর অভাবে স্কুলটি উঠে যেতে বাধ্য হয়।

১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, তৃতীয় অধ্যায়।

অক্লান্তকর্মী ছিলেন বলে বিদ্যাসাগরের যে স্তুতিবাদ করা হয় তিনি তাঁর সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন। নানাপ্রকারের কার্যকলাপে আষ্টেপৃষ্ঠে পরিপূর্ণ তাঁর সমগ্র জীবনটিই এবিষয়ে সাক্ষ্য বহন করছে। কত বিচিত্র রকমের ছিল এঁর কাজ এবং কত বিস্তৃত ছিল সেগুলির পরিসর তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায় ১৮৫১ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজে তাঁর অধ্যক্ষতার স্বল্পস্থায়ী ব্যাপ্তিকালের মধ্যে।

সংস্কৃত কলেজের প্রশাসনিক সমস্ত দায়িত্ব বহন করা ছাড়া এই সময় তিনি দক্ষিণ বাংলার চারটি জেলায় স্কুল-ইন্‌স্পেক্টারের কাজ করতেন। এই কাজে সারাক্ষণের দেখাশোনা এবং প্রচুর সফর করার প্রয়োজন হত। একটা কিছু গড়ে তোলার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি শিক্ষকদের জন্যে কয়েকটি প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়, কয়েকটি আদর্শ বিদ্যালয় এবং বালিকাদের জন্যে কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সুপ্রতিষ্ঠিত চলন্ত অবস্থার স্কুলের তুলনায় শুরুর দিকে ঐ স্কুলগুলির জন্যে অনেক বেশী মনোযোগ দেওয়ার এবং দেখাশোনার কাজের প্রয়োজন হত। স্কুলগুলি গড়ে ওঠার সময়টায় তাদের প্রতি যতটা মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক হত, বিদ্যাসাগর অকুণ্ঠচিত্তে তা দিতেন। এ সমস্তের সঙ্গে সঙ্গে এই সময় তিনি প্রতিষ্ঠাতা বীট্‌ন্‌-এর নামে নামকরণ করা কলকাতার একটি নব-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারির পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ছাত্রদের বিদ্যার্জনের বিভিন্ন পর্বে তাদের পাঠ্যপুস্তকের যোগান অব্যাহত রাখবার জন্যে এই সময়েই তিনি সংস্কৃতে এবং বাংলায় সম্পূর্ণ একপ্রস্থ গ্রন্থ-রচনার কাজও হাতে নেন। আবার এই সময়েই তিনি প্রারম্ভিক এবং অগ্রসর ছাত্রদের জন্যে দুই পর্যায়ের দুটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। বর্ণপরিচয়ের বই থেকে শুরু করে 'বোধোদয়', 'কথামালা,' প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে 'শকুন্তলা'তে যে বাংলা পাঠ্যপুস্তকগুলির একপ্রস্থ শেষ হয়েছে, তাও লেখা হয় এই সময়ের মধ্যেই।

সর্বশেষ, কিন্তু নিশ্চয়ই সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন, যে-কাজ তিনি এই সময়ের মধ্যে করেছিলেন, তা হল, হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ বিধিসম্মত করে আইন প্রণয়নের জন্যে সরকারকে রাজী করবার জন্যে প্রচেষ্টা। এজন্যে বিধবাদের পুনর্বিবাহের সমর্থন আছে এমন শাস্ত্রবাক্য খুঁজে বের

করবার জন্যে তাঁকে যে প্রাচীন পুঁথিপত্র ঘাঁটতে হয়েছিল, জনসাধারণকে পড়াবার জন্যে যে-সব প্রচারপত্র ইত্যাদি লিখতে হয়েছিল এবং তাদের সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে যে-সব সভাসমিতি করতে হয়েছিল, একমাত্র সেগুলিই ছিল একজন কর্মিষ্ঠ মানুষের সমস্ত কর্মক্ষমতা দখল করে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কাছে এগুলি ছিল অনায়াসসাধ্য ব্যাপার। তিনি এই শ্রমসাপেক্ষ আন্দোলন অন্য কারও সাহায্য না নিয়ে একলাই চালিয়েছিলেন, এবং শুধু তাই নয়, তাঁর অন্যান্য বিষয়ের কর্মসূচীর মধ্যে মানিয়ে নিয়ে এরও স্থান করে নিয়েছিলেন। বাস্তবিক, আয়াসসাধ্য কাজ করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল অপরিসীম। তাঁর চরিত্রের এই দিক্‌টি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মনে যে এমন গভীর দাগ কেটেছিল তার যথেষ্ট কারণ ছিল সন্দেহ নেই।

একই স্থান থেকে তাঁর অন্য যে প্রশস্তিটি এসেছিল, তা তাঁর সমবেদনাশীল মনটিকেই বড় করে দেখেছিল। তাঁর স্বভাবে এটি ছিল এতই বড় একটি বৈশিষ্ট্য যে, এ নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের কোনো প্রয়োজনই নেই। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তাঁর অগণিত দয়াদাক্ষিণ্যের কাজ তাঁর স্বভাবের এই দিক্‌টিকে জনসাধারণের দৃষ্টিতে এমন প্রোজ্জ্বল করে তুলে ধরেছিল যে, তাদের কাছ থেকে তিনি 'দয়ার সাগর' এই উপাধিটি লাভ করেছিলেন। পূর্বেকার এক অধ্যায়ে এও বলা হয়েছে যে, এ দেশের নারীদের সম্বন্ধে হৃদয়হীন একটা সমাজের অবিচারমূলক ব্যবহার লক্ষ্য করে তিনি যে বেদনা অনুভব করতেন, তাই তাঁকে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত করেছিল। সাধারণভাবে তিনি যে মানব-কল্যাণের জন্যে ভাবতেন, তার মধ্যেও তাঁর স্বভাবের এই দিক্‌টিরই সুস্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে।

বিদ্যাসাগরের ধীশক্তি এবং হৃদয়বত্তার কয়েকটি দিক্ নিয়ে মধুসূদন দত্ত সংক্ষেপে এই যা বলেছেন তা বেশ ব্যাপক ধরণের হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে এই অভাবটি থেকে গেছে, যে বিদ্যাসাগরের বড় বড় সব গুণগুলির উল্লেখ আলাদা করে এতে করা হয়নি। অবশ্য, কেন যে করা হয়নি তার কারণ ছিল। বর্ণিত মানুষটির চরিত্র ছিল এতই জটিল এবং তার থেকে পলকাটা হীরের মত এত বহুমুখী আলোর বিচ্ছুরণ হত, যে, কোনো একজন

গুণগ্রাহীর পক্ষে তার একটি সম্পূর্ণ চিত্র আঁকতে পারা সম্ভব ছিল না। সুতরাং তার সঙ্গে অন্যদের মূল্যায়নও সংযোগ করা প্রয়োজন। সৌভাগ্যের বিষয় এরকমের দ্বিতীয় একটি মূল্যায়ন আমরা পাচ্ছি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে।

বিদ্যাসাগর-চরিত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল: তাঁর পুরুষোচিত তেজস্বিতা, যা কোনো প্রভুত্বের কাছে নতি স্বীকার করত না, আর তাঁর মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।"[১]

বুঝতে পারা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন চোখে এমন অসাধারণত্ব কিছু ধরা পড়েছিল যা মধুসূদনের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। বিদ্যাসাগর ছিলেন স্বভাব-সুজন, এবং তাঁর ব্যবহারেও ছিল সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু এ ছিল তাঁর চরিত্রের কেবল একটিমাত্র দিক্। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোনো মানুষের কাছে অবমাননা স্বীকার করার মত লোক বিদ্যাসাগর ছিলেন না, তা সে-মানুষ যতই মহাপরাক্রান্ত হোন না কেন। এরকম মানুষের সংস্পর্শে এলেই বিদ্যাসাগরের মধ্যে কেমন একটা আড়ষ্টতা, একটা ক্ষমাহীন কাঠিন্য এসে যেত। মানুষটির কাছ থেকে যেরকম ব্যবহার নিজে পেতেন, ঠিক সেইরকম ব্যবহার তাকে ফিরিয়ে দিতে দ্বিধামাত্র বোধ করতেন না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্যগুণটির নাম দিয়েছেন, মনুষ্যত্ব। তিনি এই গুণটিকে কারুণ্য থেকে আলাদা করে আরো বড় করে ভেবেছেন এবং শুদ্ধমাত্র মনের কল্যাণকামিতার চেয়ে বেশী কিছু এর মধ্যে দেখেছেন। মনে হয় তিনি যেন বলতে চেয়েছিলেন, যে, নানা তুচ্ছ বিষয়ে কতকগুলি বদ্ধমূল সংস্কার এবং সে-সম্পর্কিত বাদানুবাদের ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে বিদ্যাসাগর সর্ব-সংস্কারমুক্ত উদারচেতা মানুষের মত সব বিষয় বিচার করতে পারতেন, আর সেইজন্যই তাঁর মানবিকতা ছিল ব্যাপক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের যে রচনাটির থেকে ইতিপূর্বে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তারই মধ্যেকার একটি মন্তব্য থেকে উপরে যা বলা হল তার সমর্থন পাওয়া যাবে। মন্তব্যটি এই:

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগরচরিত।

"বিদ্যাসাগরের চরিত্রের যাহা সর্বপ্রধান গুণ, যে গুণে তিনি পল্লী আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালী জীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতি প্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া—হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে—করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আমি যদি অদ্য তাঁহার সেই গুণকীর্তন করিতে বিরত হই, তবে আমার কর্তব্য একেবারেই অসম্পন্ন থাকিয়া যায়।"

ভারতবর্ষ সে-সময় যে বৈদেশিক শক্তির শাসনাধীন ছিল তার প্রতিভূদের কাছে তাঁর স্বভাবের যে পৌরুষ হীনতা স্বীকার করতে দিত না, তাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারের মধ্যেই তার চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু কথা দিয়ে বলবার চেষ্টা করলে যতটা বলা হবে, নীচে যে দুটি বহুশ্রুত ইতিবৃত্তের পুনরাবৃত্তি করা হল তাতে সেটা তার চেয়ে অনেক ভাল্ করে বলা হবে।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের এ্যাসিস্টান্ট সেক্রটারি রূপে কাজ করছিলেন, তখন একবার কি-একটা কাজের উপলক্ষে হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কার্-এর সঙ্গে দেখা করতে যান। বিদ্যাসাগরকে প্রিন্সিপ্যালের কামরায় নিয়ে যাওয়া হলে তিনি দেখে বিরক্ত হলেন যে জুতো সুদ্ধ দুটি পা টেবিলের উপর তুলে দিয়ে প্রিন্সিপ্যাল তাঁর চেয়ারটিতে আধ-শোয়া হয়ে বসে আছেন। বিদ্যাসাগরকে বসবার জন্যে একটি চেয়ারও দিতে বলা হল না। মনে হয়, শাসক-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিটি বিদ্যাসাগরকে যে এইভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন তার কারণ, তাঁর বিবেচনায় পরাধীন জাতির একটা মানুষ যত খ্যাতিমান্ই হোক, এই রকম ব্যবহারই তার প্রাপ্য। যে আশ্চর্য আত্মসংযম প্রচুর পরিমাণে স্বভাবে তাঁর ছিল· সেটাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যাসাগর এই অপমান গায়ে মাখবেন না স্থির করলেন এবং তাঁর কাজের কথা শেষ হবামাত্র নিঃশব্দে চলে এলেন। যে বিরক্তি তিনি বোধ করেছিলেন তার এতটুকু লক্ষণও প্রকাশ পেল না।

তারপর এমন একটি দিন এল যখন কোনো একটা কাজের বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য কার্-কে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে আসতে হল। যে অপমান তাঁকে করা হয়েছিল তা ফিরিয়ে দেবার এই সুবর্ণসুযোগটির জন্যে বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন। তাই কার্ যখন তাঁর

ঘরের ভিতরে এলেন, তখন দেখতে পেলেন, তিনি যেইভাবে বসে বিদ্যাসাগরকে সেদিন অভ্যর্থনা করেছিলেন, বিদ্যাসাগরও ঠিক সেইভাবেই বসে আছেন, কেবল টেবিলে তোলা তাঁর পদযুগলে জুতোর বদলে রয়েছে চটি।

বলা বাহুল্য, এইরকমের অভ্যর্থনা পেয়ে কার্ খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি এডুকেশন কমিটির প্রেসিডেন্ট মিঃ মুয়াটের কাছে এ নিয়ে অভিযোগ করেন। বিদ্যাসাগরের কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হলে, এত তাড়াতাড়ি সেটা চলে এল, যেমনটি সচরাচর দেখা যায় না। এর মধ্যে স্পষ্টবাদিতা যেমন ছিল, তেমনই আঘাত করবার ইচ্ছাও ছিল কম নয়। বিদ্যাসাগরের কৈফিয়ৎ ছিল এই যে, প্রিন্সিপ্যাল তাঁকে ইতিপূর্বে যেভাবে একদিন অভ্যর্থনা করেছিলেন, তিনি শুধু সেটিকে আদর্শ করে তার অনুকরণ করেছেন এই ধারণা নিয়ে, যে, তিনি একজন সংস্কৃতিবান্ ইংরেজের ভদ্রব্যবহারেরই অনুকরণ করছেন। এরপর কর্তৃপক্ষের চাপে পড়ে কার্‌কে এই ব্যাপারটির নিষ্পত্তি বন্ধুভাবেই করে নিতে হয়েছিল।[১]

কার কাছে যাচ্ছেন, কি উপলক্ষেই বা যাচ্ছেন সে বিষয়ে চিন্তা না করে বিদ্যাসাগর যে সর্বত্রই তাঁর স্বদেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করে যাবার জন্যে জেদ করতেন, তার মধ্যেও তাঁর আত্মসম্মান-বোধেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তখনকার দিনের বাঙালী পণ্ডিতদের ধরণে একটি ধুতি, ঊর্দ্ধাঙ্গ আবৃত করবার জন্যে একটি উত্তরীয় এবং পায়ে একজোড়া চটি, এই পরে সাজতেই বিদ্যাসাগর আনন্দ অনুভব করতেন। কিন্তু যে কোনো রকম চটি জুতা হলেই কিন্তু তাঁর চলত না, মাথা ওল্টানো একরকম চটিজুতা, যার স্থানীয় নাম তালতলার চটি, তারই প্রতি ছিল তাঁর পক্ষপাত। তিনি সর্বদা এই চটি পরে থাকতেন বলে এগুলির নামই হয়ে গেল বিদ্যাসাগরী চটি। সে সময়ে ভদ্রলোকদের বাইরে যাবার পোশাক ছিল পাজামা এবং উপরের লম্বা ঝোলা জামা, তাছাড়া মাথায় পাগড়ি যার নীচেটায় বিড়ের মত একটা বেড়। এই পোশাক বিদ্যাসাগর পছন্দ করতেন না। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, কোনো পোশাক যদি একজন শ্রদ্ধার যোগ্য পণ্ডিতের পক্ষে ভাল বলে স্বীকৃত হয়, তবে সেটাকে সর্ব অবস্থাতেই ভাল বলে মানতে হবে।

১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ অধ্যায়।

বাংলাদেশের তৎকালীন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত প্রীতির চোখে দেখতেন এবং তাঁর পরামর্শের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি প্রায়ই বিদ্যাসাগরকে তাঁর বেলভে-ডিয়ারের বাড়ীতে ডেকে পাঠাতেন। স্যার ফ্রেডারিকের ইচ্ছাকে মান্য করে তিনি গোড়ার দিকে কয়েকবার বাইরের আনুষ্ঠানিক পোশাকে তাঁর কাছে এসেছিলেন কিন্তু কিছুদিন যেতেই তাঁর নিজস্ব পোশাকটির প্রতি তাঁর পক্ষপাত প্রবল হয়ে উঠল। তাই একদিন তিনি হ্যালিডেকে চূড়ান্ত শর্তের মত করে একথা জানিয়ে দিলেন, যে, হয় তাঁকে তাঁর নিজের অভ্যাস্ত পোশাক পরে আসতে দিতে হবে, নয়ত তাঁর আসা এর পর একবারে বন্ধ হয়ে যাবে। লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর কেবল যে বিদ্যাসাগরের বুদ্ধি-পরামর্শকেই অত্যন্ত বেশী মূল্য দিতেন তা নয়, অন্যের মনের কথা বুঝতে পারার মত মনও ছিল তাঁর, তাই দ্বিরুক্তি না করে তিনি বিদ্যাসাগরের দাবী মেনে নিলেন। তখন থেকে বাঙালী পণ্ডিতদের অনাড়ম্বর পরিধেয় বস্ত্রে সজ্জিত হয়েই তিনি ছোটলাটের বাড়ী যাওয়া-আসা করার অবাধ অধিকার পেয়ে গেলেন। এইভাবে বিদ্যাসাগরের মধ্যে দিয়ে পোশাকটির মর্যাদা রক্ষা পেল।[১]

তাঁর যে উদার মানবিকতার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ এমন উচ্ছ্বসিত ভাষায় করেছেন তা নিয়ে এই অধ্যায়ের শুরুতেই আমরা আলোচনা করেছি। এইটুকু কেবল বলতে বাকী আছে, রবীন্দ্রনাথও যা বলেছেন, তা হল এই যে তাঁর পরোপকারবৃত্তি-প্রণোদিত সেবার কাজ কোনো ক্ষুদ্র জনসমষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। অবহেলিত শ্রেণীর মানুষ মাত্রেরই কথা তিনি বিশেষ করে ভাবতেন এবং সেটা করতেন জাত ও ধর্ম নির্বিশেষে। হিন্দু নারীদের সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতার কারণ, সমাজে তাঁদের জন্যে যে স্থানটি নির্দিষ্ট ছিল সেখানে নানারকমের অবিচারের দ্বারা তাঁরা নিপীড়িত হতেন। সাঁওতালদের সেবাতে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কারণ, সমাজে তারা ছিল অবহেলিত। যখন দুর্ভিক্ষ বা মহামারীতে আর্তত্রাণ কার্যের ডাক আসত, তখন তিনি সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের সেবা সমভাবে করতেন। বর্দ্ধমানে যখন ম্যালেরিয়া রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দেয় তখন তিনি রোগীদের

১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, পঞ্চম অধ্যায়।

চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার জন্যে যে অভিযান শুরু করেছিলেন তাতে তাঁর মনোযোগের বেশীর ভাগ মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর ব্যয়িত হয়েছিল।[১]

এই উদার-চরিত্র মানুষটির মনের ভিতরটা এত অসংখ্য গুণের আকর স্বরূপ ছিল যে উপরে বর্ণিত দুজন বিখ্যাত ব্যক্তির মূল্যায়নেও তাদের সব ক'টির উল্লেখ নেই। তাঁদের গুণ-বর্ণনা পরস্পরের পরিপূরক বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্ণিত মানুষটির এমন অনেক সুন্দর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কথা তাঁরা বাদ দিয়ে গিয়েছেন, যেগুলির কথা না বললে তাঁর একটি সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। সুতরাং সেগুলির সম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন।

বিদ্যাসাগরের ন্যায়পরতা-বোধ এবং যথাযোগ্য আচরণ সম্বন্ধে সচেতনতা ছিল খুবই তীক্ষ্ণ। জনসাধারণের সঙ্গে যাঁর নিত্য কারবার, তাঁর মত আয়তনের সেরকম একজন মানুষের পক্ষে এই গুণদুটি অপরিহার্য। যে বৃত্তান্তগুলি সংক্ষেপে নীচে বর্ণিত হচ্ছে তাদের মধ্যে এর উদাহরণ পাওয়া যাবে।

এদেশীয় এবং ইংরেজী ভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের জন্যে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন সরকার কর্তৃক সেণ্ট্রাল টেক্স্‌ট্ বুক কমিটি স্থাপিত হল, তখন সেই সময়কার ডিরেক্টর অব পাব্‌লিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন, ডব্লিউ এস্‌ এ্যাট্‌কিন্‌সন, এই বলে বিদ্যাসাগরকে তার সভ্য হয়ে কাজ করার আমন্ত্রণ জানালেন, যে, একাজের জন্যে "এদেশীয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন।" যে দুটি কারণ দেখিয়ে বিদ্যাসাগর এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন, তা এসম্পর্কিত তাঁর চিঠির নিম্নোক্ত অনুবাদে পাওয়া যাবে:

"স্কুল বুক কমিটিতে কাজ করার জন্য আপনার এই আমন্ত্রণ আমি খুশী হয়েই স্বীকার করতাম, কিন্তু দুটি বিষয় বিবেচনা করে আমি এটি প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হচ্ছি। কমিটির সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে গ্রন্থকার হিসাবে আমার স্বার্থ বিজড়িত থাকবে, এবং সেহেতু আমি মনে করি এই কমিটির মন্ত্রণা ইত্যাদিতে আমার যোগ দেওয়া সমীচীন হবে না। এ ছাড়া আমার বিবেচনায় কমিটিতে আমরা উপস্থিতি বইগুলির দোষগুণ বিষয়ে স্বচ্ছন্দ এবং অবাধ আলোচনায় বাধাস্বরূপ হতে পারে।"[২]

১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, নবম অধ্যায়।

২। ডব্লিউ এস্‌ এ্যাট্‌কিন্‌সনকে লেখা বিদ্যাসাগরের চিঠি, তারিখ ১০ই জুলাই, ১৮৭৩।

হড্‌সন নামক একজন ইংরেজ প্রতিকৃতি-আঁকিয়েকে পাইকপাড়ার রাজা তাঁর পরিবারবর্গের প্রতিকৃতি আঁকবার কাজে নিয়োজিত করেন। কোনো এক উপলক্ষে সেই বাড়ীতে এলে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে চিত্রকরের সাক্ষাৎ হয়। বিদ্যাসাগরের বয়স তখন সবে ত্রিশের কোঠায় পড়েছে। তাঁর চেহারাতে এমন কিছু ছিল যাতে তাঁকে অসাধারণ মানুষ বলে বোঝা যায়। অভিজ্ঞ চিত্রকরের দৃষ্টিতে এটা এড়িয়ে গেল না, একটি ছবি আঁকতে দেবার জন্যে বসতে তিনি বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করলেন এবং বিদ্যাসাগর তাতে রাজী হলেন।

প্রতিকৃতিটি আঁকা যখন শেষ হল, তখন বিদ্যাসাগরকে বিস্মিত করে দিয়ে হড্‌সন প্রস্তাব করলেন, এটিকে তিনি উপহার স্বরূপ বিদ্যাসাগরকে দেবেন, এর জন্যে কোনো পারিশ্রমিক নেবেন না এই কারণে, যে, এটা তিনি শখ করে এঁকেছেন। যখন কিছুতেই শিল্পীকে পারিশ্রমিক নিতে রাজী করানো গেল না, তখন তাঁকে তার পরিবর্তে কিছু দেওয়ার জন্যে বিদ্যাসাগর এক ফন্দি আঁটলেন। তিনি শিল্পীকে দিয়ে নিজের পিতা এবং মাতার দুটি ছবি আঁকিয়ে নিলেন এবং সেই কাজের জন্যে প্রচুর পারিশ্রমিক তাঁকে দিলেন।

আর একবার বিদ্যাসাগর মিস্টার মোয়ালের অনুরোধ ক্যাপ্টেন ব্যাঙ্ক নামক এক ব্যক্তিকে কিছুদিন সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দী শিখিয়েছিলেন। শেখানোর পালা শেষ হলে সামরিক কর্মচারীটি তাঁকে মাসে ৫০ টাকা হিসাবে বেতন দেবার প্রস্তাব করেন। এ হল সেই সময়কার কথা যখন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের এ্যাসিস্টান্ট্‌ সেক্রেটারির কাজে ইস্তফা দিয়েছেন এবং অন্য কোনো চাকরি তখনো নেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই বেতন নিতে রাজী হলেন না এই কারণ দেখিয়ে, যে, তিনি একজন বন্ধুর অনুরোধে বন্ধুর কাজ হিসাবে যে শিক্ষকতা করেছেন তার জন্যে কোনো পারিশ্রমিক নেবার প্রশ্নই উঠতে পারে না।[১]

বিদ্যাসাগর ছিলেন এই রকমের বহুদিকে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। উনিশ শতকে বাংলার যে বহুসংখ্যক মহৎ ব্যক্তি পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শ-জনিত সংঘাতে সক্রিয়ভাবে সাড়া দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে মনকে আকর্ষণ করার মত যাঁরা ছিলেন, বিদ্যাসাগর নিঃসন্দেহে ছিলেন তাঁদের একজন। শেষ করার আগে আমরা তাঁর চরিত্রের এমন একটি দিকের কথা বলব যাতে সহজ মানবতার একটি ভাবসমৃদ্ধ পরিচয় পাওয়া যায়।

১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, পঞ্চম অধ্যায়।

বিদ্যাসাগরের জীবনযাত্রায় ছিল কঠোর সারল্য এবং কৃচ্ছ্রতা। কিন্তু কেবল দুটি বিলাসের উপকরণ নিজের জন্যে তাঁর বরাদ্দ ছিল। অন্যদের থেকে অনেক উপরের জায়গার মানুষ ছিলেন বলে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ মানুষ। এইজন্যে তিনি প্রকৃতি ও বইয়ের সঙ্গ চাইতেন। যখন আর্থিক সঙ্গতির দিক্ দিয়ে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন, তখন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য কলকাতার বাদুড়বাগানে, তিনি নিজের জন্যে একটি বসতবাড়ী নির্মাণ করান। এই বাড়ীটি দুটি বিশেষত্বের জন্যে প্রখ্যাত ছিল: বাড়ীর সম্মুখে সুন্দর করে সাজানো একটি বাগান, তিনি নিজেই যার পরিচর্যা করতেন, এবং চমৎকার একটি গ্রন্থাগার। তাঁর বইগুলিকে তিনি প্রাণ ঢেলে ভালবাসতেন, এবং প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থ, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, এই সমস্ত সংগ্রহ করার কাজের প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল। এই বইগুলি সম্বন্ধে মালিকানা-সূচক এমন একটি মনোভাব তাঁর ছিল, যার পরিচয় আর কোনো ক্ষেত্রে পাওয়া যেত না। বইগুলি তাঁর যে কত ভালবাসার জিনিস ছিল, এই থেকেই সেটা বোঝা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঘটনার কথা বলা যাক।

গোড়ার দিকে তাঁর লাইব্রেরীর বই বন্ধুদের ধার দিতে বিদ্যাসাগর আপত্তি অনুভব করতেন না। কিন্তু একবারকার একটি ঘটনায় তিনি মনে এমনই আঘাত পেলেন যে তাঁর লাইব্রেরী থেকে বই ধার নেওয়া নিষিদ্ধ করে দিলেন। একজন বন্ধু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ধার নিয়ে তারপর সেটি ফিরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি। বিদ্যাসাগর বইটির কথা তাঁকে মনে করিয়ে দিলে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা না করে বলে দিলেন, বইটি তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনি যে স্পষ্টতঃই মিথ্যা কথা বলছিলেন, কয়েকদিন পরই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। পুরাতন পুস্তকের একজন ব্যবসায়ী, যে প্রায়শঃই বিদ্যাসাগরের কাছে বই বিক্রি করত, একদিন বিক্রয়ের মানসে কতগুলি দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সংগ্রহ তাঁকে দেখাতে নিয়ে এল। একসঙ্গে পুলকিত এবং মর্মাহত হয়ে বিদ্যাসাগর দেখলেন, এই সংগ্রহের মধ্যে তাঁর বন্ধুকে ধার দেওয়া সেই বইটিও রয়েছে। বুঝতে বাকী রইল না, বন্ধুটি বইটি ধার নিয়ে এই ব্যবসায়ীকে বিক্রি করেছেন।

এই জীবনালেখ্যটির সঙ্গে সম্পর্কিত গ্রন্থতালিকা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত গ্রন্থাবলী

বেতাল-পঞ্চবিংশতি। ১৮৪৭। গল্প-সঙ্কলন।

বাংলার ইতিহাস। ১৮৪৮।

জীবনচরিত। সেপ্টেম্বর, ১৮৪৯। কয়েকটি জীবনালেখ্য।

বোধোদয়। এপ্রিল, ১৮৫১। বাংলার প্রাথমিক পাঠ।

উপক্রমণিকা। নবেম্বর, ১৮৫১। সংস্কৃত ব্যাকরণ-জ্ঞানের প্রাথমিক সোপান।

ঋজুপাঠ। প্রথম ভাগ, নবেম্বর, ১৮৫১। দ্বিতীয় ভাগ, মার্চ, ১৮৫২। তৃতীয় ভাগ, জানুয়ারী, ১৮৫৩। সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ।

ব্যাকরণ-কৌমুদী। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৫৩। তৃতীয় ভাগ, ১৮৫৪। সংস্কৃত ব্যাকরণ।

শকুন্তলা উপাখ্যান। ডিসেম্বর, ১৮৫৪। মহাভারতের গল্প অবলম্বনে রচিত।

বিধবা-বিবাহ। জানুয়ারী, ১৮৫৫। বিধবা-বিবাহের সমর্থনে রচিত পুস্তিকা।

বর্ণপরিচয়। প্রথম ভাগ, এপ্রিল, ১৮৫৫। দ্বিতীয় ভাগ, জুন, ১৮৫৫। বাংলা বর্ণমালা ও শব্দগঠনের শিশুপাঠ্য পুস্তক।

কথামালা। ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬। বাংলা সাহিত্যপাঠ।

চরিতাবলী। জুলাই, ১৮৫৬। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত জীবনী।

মহাভারত। (উপক্রমণিকা)। জানুয়ারী, ১৮৬০। বাংলায় মহাভারত।

সীতার বনবাস। এপ্রিল, ১৮৬০। রামায়ণের গল্প।

ব্যাকরণ-কৌমুদী। চতুর্থ ভাগ, ১৮৬২। সংস্কৃত ব্যাকরণ।

আখ্যানমঞ্জরী। নবেম্বর, ১৮৬৩। আখ্যায়িকা-সংগ্রহ।

শব্দমঞ্জরী। ১৮৬৪। বাংলা অভিধান।

ভ্রান্তিবিলাস। ১৮৬৯। শেক্‌স্‌পিয়ারের Comedy of Errors-এর অনুসরণে রচিত হাসির গল্প।

ভূগোল-খগোল-বর্ণনম্। এপ্রিল, ১৮৯২ (বিদ্যাসাগরের মরণোত্তর প্রকাশনা)। জ্যোতিষ এবং ভূগোল বিষয়ক সংস্কৃত পদ্য।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

অন্নদামঙ্গল। দুই খণ্ড, ১৮৪৭। ভারতচন্দ্র রায় রচিত কাব্য।
বেতাল-পঁচিশী। জানুয়ারী, ১৮৫২। হিন্দীতে বেতাল-পঞ্চবিংশতির গল্প।
রঘুবংশম্। জুন, ১৮৫৩। কালিদাস-রচিত মহাকাব্য।
কিরাতার্জ্জুনীয়ম্। ১৮৫৩। ভারবি-বিরচিত মহাকাব্য।
সর্বদর্শন সংগ্রহ। ১৮৫৩-৫৮। ভারতীয় দর্শন পরিচিতি।
শিশুপাল-বধম্। ১৮৫৭। মাঘ-বিরচিত মহাকাব্য।
কুমারসম্ভবম্। ১৮৬১। কালিদাস রচিত মহাকাব্য।
কাদম্বরী। ১৮৬২। বাণ-রচিত গদ্যে প্রণয়ঘটিত কাহিনী।
মেঘদূতম্। এপ্রিল, ১৮৬৯। কালিদাস-রচিত রম্য-কাব্য।
উত্তরচরিতম্। নবেম্বর, ১৮৭০। ভবভূতি-রচিত নাটক।
অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্। জুন, ১৮৭১। কালিদাস-রচিত নাটক।
হর্ষ-চরিতম্। মার্চ, ১৮৮৩। বাণ-রচিত হর্ষবর্দ্ধন-জীবনী।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। (সাহিত্যসাধক-চরিতমালা।)
বিদ্যাসাগর। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
আত্মজীবনী। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
পুরাতন-প্রসঙ্গ। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়: কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য।
বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ। বিনয় ঘোষ।
বিদ্যাসাগর। বিহারীলাল সরকার।
বিদ্যাসাগর-চরিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৮	তাই পরের শতকে সঞ্চারিত হল	তাই অঙ্কুরিত হয়ে পরের শতকে মঞ্জরিত হল
১২		ফুটনোট	এটি বসবে ১১ পৃষ্ঠার নীচে, ১৫ ছত্রের 'অন্ধকার যুগে' কথাটি সম্পর্কে
২১	৯	আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা
৪৪	২৪-২৫		২৪ ছত্রের "১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে" এই কথা দুটি ২৫ ছত্রের "বৎসর পরে" কথা দুটির পরে বসবে
৭০	১৫	করতে	করিতে
৭৪	৫	নিষ্প্রযোজন	নিষ্প্রয়োজন
৮১	১১	কাপনাকে	আপনাকে